কর্নেলের ভূত-প্রেত রহস্য

কর্নেলের ভূত-প্রেত রহস্য



—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশ করেছেন :
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

দ্বিতীয় প্রকাশ :
শ্রাবণ, ১৩৬৭

সম্পাদনায় :
শ্রীসুজিত কুমার নাগ

প্রচ্ছদ :
শ্রীশৈলেশ পাল

মুদ্রাকর :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৬



কালিকাপুরের ভূত রহস্য

॥ এক ॥

সেবার ডিসেম্বরেও কলকাতায় তত শীত পড়েনি। এক রবিবারে অভ্যাসমতো কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে আড্ডা দিতে এসেছিলুম। দেখলুম কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে যথারীতি চুরুট টানছেন, আর সোফার কোণের দিকে বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ আমাদের প্রিয় হালদারমশাই ডানহাতে খবরের কাগজ আর বাঁ-হাতে এক টিপ নস্যি নিয়ে বসে আছেন। আর কর্নেলের কাছাকাছি যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কাঁচুমাচু মুখে বসে আছেন, তাঁকে দেখেই বোঝা গেল তিনি মফস্বলের মানুষ। কলকাতার লোকজনের চেহারা আর হাবভাবে বেশ খানিকটা চেকনাই থাকে। এই ভদ্রলোক মুখ তুলে আমাকে দেখে আর-একটু আড়ষ্টভাবে সরে বসলেন। কর্নেলের জাদুঘর সদৃশ ড্রইংরুমে ঢুকেই আমি সম্ভাষণ করেছিলুম,—মর্নিং কর্নেল।

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে গলার ভেতরে 'মর্নিং' আউড়ে আবার চোখ বুজলেন।

ভদ্রলোকের সামনে দিয়ে এগিয়ে আমি সোফার শেষপ্রান্তে বসলুম। এতক্ষণে হালদারমশাই নস্যি নাকে গুঁজে কাগজ নামিয়ে রেখে মৃদুস্বরে বললেন,—আয়েন জয়ন্তবাবু, বয়েন। আপনাগোর সত্যসেবক পত্রিকায় আইজ তেমন কিসু নাই।

আমি চোখের ইশারায় প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললুম,—আছে। সবকিছু কি কাগজে ছাপা হয়!

আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—হ, ঠিক কইসেন।

ইতিমধ্যে ষষ্ঠী আমার জন্যে এক পেয়ালা কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম,—এবার ডিসেম্বরেও কলকাতায় শীতের দেখা নেই। ফ্যান চালাতে হচ্ছে।

আমার কথা শুনে সেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন,—আপনাদের কলকাতা শহরে এসে আমাকে সোয়েটার খুলতে হয়েছে। সোয়েটারের ওপর ওই দেখছেন একখানা শাল, তাও জড়ানো ছিল। আমাদের কালিকাপুরে গেলে কিন্তু শীতের কামড়ে আপনার হাড় নড়িয়ে দেবে।

কর্নেল তো তুম্বো মুখে চোখ বুজে কী ধ্যান করছেন, কে জানে।

কালিকাপুরের ভদ্রলোক কথা বলায় গুমোট ভাবটা কেটে গেল। জিগ্যেস করলুম,—আপনি কালিকাপুর থেকে আসছেন? সেটা কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন,—আজ্ঞে বেশি দূরে নয়, মোটে ঘণ্টাচারেকের ট্রেন জার্নি। স্টেশন থেকে নেমে এক্কাগাড়ি, সাইকেলরিকশা, বাস—সবই পাওয়া যায়। গঙ্গার ধারে আমাদের গ্রামটা এখন আর গ্রাম নেই। ইলেকট্রিসিটি এসেছে, টেলিফোন এসেছে, নিউ টাউনশিপ হয়েছে।

ভদ্রলোক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কর্নেল চোখ খুলে বললেন,—আপনার বাড়িতে আপনার বাবা আর কাকা ছাড়া আর কে-কে থাকেন?

ভদ্রলোক বললেন,—আমার এক বিধবা পিসি থাকেন। আমার মা তো অনেক বছর আগে মারা গিয়েছেন। কাকা বিয়ে করেননি। সাধুসন্ন্যাসীর মতো ওঁর চালচলন। আমরা ভাবি কবে হয়তো কাকা সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যাবেন। অথচ আপনাকে বলেছি আমার বাবা রুগ্ন মানুষ, বাড়ি থেকে বেরোতেই পারেন না। কিন্তু কাকার শরীর-স্বাস্থ্য খুব ভালো। নিয়মিত যোগব্যায়াম করেন কিনা।

কর্নেল বললেন,—বাড়িতে কাজের লোক নিশ্চয়ই আছে?

ভদ্রলোক বললেন,—হ্যাঁ, তা আছে। মানদা নামে একটি মেয়ে প্রতিদিন ভোরবেলা আসে, সারাদিন থেকে সন্ধের পর নিজের খাবারটা বেঁধে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। আপনাকে তো বলেছি, ব্যাপারটা প্রথম তারই চোখে পড়ে। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন কর্নেলসাহেব।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। আপনি বলছিলেন বটে। কিন্তু মানদা তখনই ফিরে এসে কথাটা আপনাদের বলেনি কেন? আপনি বলছিলেন পরদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফেরার সময়েই সে কথাটা আপনার পিসিমাকে বলেছিল —তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলুম। আসলে এমন একটা গোলমেলে ব্যাপার যে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তাতেই ইলেকট্রিক আলো আছে। গত বছর কালিকাপুরে মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে কিনা। বুঝে দেখুন স্যার, শীতের রাতে এখন ওখানে বড্ড কুয়াশা হয়। তা হলেও মানদা স্পষ্ট চিনতে পেরেছিল লোকটাকে।

হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে তাকিয়ে কথা শুনছিলেন। এবার

বলে উঠলেন,—তা হইলে ক্যামনে বুঝলেন ওই লোকটাই সেই মরে যাওয়া লোক?

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বললেন,—আমাদের মানদা স্যার খুব চালাক-চতুর মেয়ে। অন্ধকারেও দেখতে পায়। তা ছাড়া যে লোকটাকে দেখেছিল, সে সম্পর্কে আমারই এক দাদা। মাসতুতো দাদা। পাঁচ বছর আগে তাকে আমরা শ্মশানে চিতায় দাহ করে এসেছি। বাবা-কাকা সবাই ছিলেন শ্মশানে।

কর্নেল বললেন,—আপনার ওই মাসতুতো দাদার নাম বিনোদ মুখুজ্যে তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরা মুখুজ্যে, আমরা চাটুজ্যে। কথাটা বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু আমাদের পাড়ার বামাপদ গোঁসাই হঠাৎ কাল কথায়-কথায় বললেন, হ্যাঁরে শচীন, তোদের বাড়ির কাছে কাল সন্ধেবেলা একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছিলুম। মাত্র হাত দশেক দূরে। দ্যাখা মাত্রই চমকে উঠেছিলাম। এ তো সেই পাগলা বিনোদ!

এবার আমি জিগ্যেস করলুম,—পাগলা বিনোদ মানে?

শচীনবাবু বললেন,—কর্নেলসাহেবকে সবই বলেছি। আমার ওই মাসতুতো দাদার কোনও চালচুলো ছিল না। কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়াত, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু পাগলামি করত। তারপর বেশ কিছুদিন খুব শান্ত আর গম্ভীর হয়ে থাকত। তাই লোকে ওকে বলত বিনোদ পাগলা, বা পাগলা বিনোদ।

কথাটা বলে শচীনবাবু সার্জের পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। তারপর করজোড়ে বললেন,—কর্নেলসাহেব, কালিকাপুরের জমিদারবাড়ির চণ্ডীবাবু আপনার কাছে পাঠিয়েছেন—সেকথা তো আগেই বলেছি। আমাদের রাতের ঘুম একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন-তখন ওই উৎপাত।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে, চণ্ডীবাবুকে গিয়ে বলবেন আমরা যে-কোনও দিন কালিকাপুরে গিয়ে হাজির হব। সেখানে কোথায় উঠব তা আগে থেকে বলতে পারছি না। তবে আপনারা নিশ্চয়ই খবর পাবেন।

কালিকাপুরের শচীনবাবু তাঁর ব্যাগের ভেতর শালটাও যেন খুলে ভরে নিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—এখনই শিয়ালদায় একটা ট্রেন আছে। ট্যাক্সি করে চলে যাব।

বলে তিনি প্রথমে কর্নেলকে, তারপর আমাদের দুজনকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন। সেই সময় লক্ষ করলুম, তিনি যেন একটু লেংচে হাঁটছেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর বললুম,—ভদ্রলোকের বাঁ-পায়ে গন্ডগোল আছে তা একটা ছড়ি হাতে নিয়ে হাঁটেন না কেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ছড়িটা উনি দরজার বাইরে ঠেকা দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ছড়ি বলা যায় না, আস্ত বাঁশ বললে ভুল হয় না। কিন্তু বেশ পালিশ করা বাঁশের লাঠি। ভদ্রতা-বশে বা যে-কোনও কারণেই হোক ওটা নিয়ে ঘরে ঢোকেননি।

জিগ্যেস করলুম,—ওঁর সেই মাসতুতো দাদা বিনোদ পাগলার ভূত কি প্রতি রাতে উৎপাত করছে?

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন,—প্রতি রাতে নয়, কিন্তু উৎপাত করছে তা বলা যায়। ওঁদের একতলা বাড়ির ছাদে ধুপ-ধাপ করে শব্দ হয়। আবার কখনও উঠোনে অনেকগুলো ঢিল পড়ে। ঢিলগুলো—এটাই আশ্চর্য দেখতে পাহাড়ি নদীতে পড়ে থাকা নুড়ির মতো।

বলে কর্নেল তাঁর টেবিলের ড্রয়ার থেকে গোটা চারেক নুড়ি বের করলেন। সেগুলো একেবারে নিটোল, কতকটা ডিমের মতো।

হালদারমশাই উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে বললেন,—মাসতুতো দাদারে দাহ করছিল ওগো শ্মশানে। গঙ্গার ধারে শ্মশান, আর তার ভূত পাহাড় অঞ্চলে যাইয়া এগুলান কুড়াইয়া আনসিল ক্যান? কর্নেলস্যার আপনি আমারে যেন সাথে লইবেন।

কর্নেল ঈষৎ কৌতুকে বললেন,—আমার মতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবেন আপনি? আপনি তো প্রফেশনাল প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

হালদারমশাই বললেন,—তাড়াইমু কর্নেলস্যার। হাতে কোনও ক্যাস নাই তাই মনটা ভালো নাই। চৌত্রিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করসি। রিটায়ার কইর‍্যা যা পাইসি তাই যথেষ্ট। এদিকে পেনশেনও পাইত্যাসি আপনার মতন।

কর্নেল চুরুটে শেষ টান দিয়ে বললেন,—ঠিক আছে, তাহলে আপনাকে যাওয়ার সময় ডেকে নেব।

ষষ্ঠী আর-এক দফা কফি নিয়ে এল। আমি আপত্তি করছিলুম, কিন্তু কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত, কেসটা তো শুনলে। পাঁচবছর আগে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া মানুষ একেবারে জলজ্যান্ত দেহে ফিরে এসেছে, এবং যারা তার সৎকার করেছিল তাদের ওপর উৎপাত চালাচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে হলে নার্ভ আরও চাঙ্গা করা দরকার।

কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে বললুম,—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে ওখানে শচীনবাবুদের কোনও শত্রুপক্ষ কোনও কারণে তাদের পেছনে লেগেছে। ওসব ভূতপ্রেতের গল্প বোগাস।

হালদারমশাই সায় দিয়ে বললেন,—হ! ঠিক কইসেন জয়ন্তবাবু। ওনাদের শত্রুপক্ষই উৎপাত করত্যাসে।

কর্নেল বললেন,—শচীন চাটুজ্যে আমাকে বেশ বড় গলায় বলেছেন, ওঁদের কোনও শত্রু নেই। শচীনবাবু স্কুল-টিচার ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন। ওঁর বাবা অহীনবাবু রুগ্ন, শয্যাশায়ী। তিনিও শিক্ষকতা করতেন। ওঁদের কাকা মহীনবাবু সংসারের কোনও সাতে-পাঁচে থাকেননি। তা ছাড়া, ওঁদের বিষয় সম্পত্তিও কিছু নেই। শুধু ওই ভিটে আর তার সংলগ্ন একটা ঠাকুরবাড়ি।

কর্নেল আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন,—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।... চণ্ডীপ্রসাদবাবু? কী ব্যাপার? এইমাত্র আপনার চিঠি নিয়ে এসেছিলেন শচীন চাটুজ্যে। তিনি চলে গেছেন। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি, কারণ আপনার সঙ্গে এই সুযোগে আবার দেখা হবে...অ্যাঁ? বলেন কী? কখন?...ও মাই গড! ব্যাপারটা তাহলে দেখছি ছেলেখেলা নয়!...ঠিক আছে। আমরা মানে আমি আর আমার তরুণ সাংবাদিক-বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী—যার কথা আপনাকে একবার বলেছিলুম। আর একজন রিটায়ার পুলিশ অফিসার, যিনি এখন পেশাদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তিনজনেই সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা হব। সম্ভব হলে আপনি...বাঃ! ঠিক আছে।...আচ্ছা, রাখছি।

কর্নেল রিসিভার রেখে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে মাথার প্রশস্ত টাকে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন।

লক্ষ করলুম গোয়ান্দাপ্রবরের হাতে কফির পেয়ালা। এবং তিনি গুলি-গুলি চোখে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। অভ্যাসমতো দুই চোয়াল তিরতির করে কাঁপছে।

আমি জিগ্যেস করলুম,—কর্নেল, কালিকাপুরে নিশ্চয়ই কোনও অঘটন ঘটেছে—প্লিজ, কথাটা খুলে বলুন।

কর্নেল এবার সোজা হয়ে বসে কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন,—একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। শচীনবাবুদের ঠাকুরবাড়ির সামনে অনেকটা জায়গায় রক্ত পড়ে আছে। ওখানে একটা হাঁড়িকাঠ

আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবমন্দিরের সামনে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

জিগ্যেস করলুম,—কিন্তু কাকে বলি দেওয়া হয়েছে?

শচীনবাবু ভোর ছ'টায় স্টেশনে গিয়েছিলেন। তাঁর বিধবা পিসি কাজের মেয়ে মানদাকে নিয়ে পুকুরঘাটে যাচ্ছিলেন। মন্দিরের সামনেই একটা পুকুর। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরুনোমাত্র হাড়িকাঠের পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে চবচবে রক্ত দেখা যায়। মানদা চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, পড়শিরা দৌড়ে আসে। কিন্তু কাকে বলি দেওয়া হয়েছে, তার লাশ পাওয়া যায়নি। পরে সবার খেয়াল হয় শচীনবাবুর কাকা মহীনবাবুর কোনও পাত্তা নেই।

হালদারমশাই বলে উঠলেন,—ওনার সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছা ছিল, শচীনবাবু কইত্যাসিলেন।

কর্নেল বললেন,—এতে স্বভাবতই লোকের সন্দেহ হয়েছে মহীনবাবুকেই কেউ বা কারা কোনও কারণে বলি দিয়ে তার লাশ গুম করে ফেলেছে। পুলিশ এসে তদন্ত করার পর চলে গেছে। জেলে নৌকাগুলোকে নাকি পুলিশ বলেছে গঙ্গায় কোনও লাশ দেখতে পেলে তারা যেন পুলিশকে খবর দেয়।

বললুম,—শচীনবাবুর কাকা মহিনবাবুকেই যে বলি দেওয়া হয়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য আজ সারাদিন অপেক্ষা করা যেতে পারে। এমন হতেই পারে, তিনি সাধু-সন্ন্যাসী টাইপের মানুষ, বাড়িতে না বলে কোথাও গঙ্গার ধারে কোনও সন্ন্যাসীকে দেখে তার কাছে বসে আছেন।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—মহীনবাবু ঘরের বারান্দায় একটা খাটিয়ায় শুয়ে থাকতেন। চণ্ডীপ্রসাদবাবু বললেন, ওটা ওঁর কৃচ্ছ্রসাধনের চেষ্টা। মশারি নিতেন না। একটা হালকা তুলোর কম্বল জোর করে তাঁকে দেওয়া হত। কিন্তু আজ তাঁর খাটিয়ার বিছানা এলোমেলো হয়ে পড়েছিল। তুলোর কম্বলটা পড়েছিল বারান্দার নীচে। শচীনবাবু ট্রেন ধরবার জন্য তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যান। তাই ওটা লক্ষ করেননি। এদিকে তাঁর পিসি সেটা লক্ষ করলেও ভেবেছিলেন, মহীনবাবু রাগ করে তুলোর কম্বল ফেলে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে তিনি এই শীতেও ঠান্ডা মেঝেয় শুয়ে থাকতেন।

হালদারমশাই বললেন,—হেভি মিস্ট্রি।

কর্নেল চুপচাপ চা খাওয়ার পর চুরুট-কেস থেকে একটা চুরুট বের করে লাইটার দিয়ে ধরালেন, তারপর ধ্যানস্থ হলেন।

এই সময় আবার টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল দ্রুত সোজা হয়ে বসে

হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে সাড়া দিলেন।—বলুন চণ্ডীবাবু...পুকুরপাড়ে রক্ত পাওয়া গেছে? আপনি পুলিশকে চাপ দিলে পুলিশ কলকাতার ডগ স্কোয়াড থেকে শিক্ষিত কুকুর নিয়ে যেতে পারে। ওখানে যে স্যান্ডেলটা পাওয়া গেছে, তা যখন মহীনবাবুর না, তখন খুনেদেরই হতে পারে...ঠিক আছে, আপনি বলুন। যদি পুলিশ ইতস্তত করে আমাকে জানাবেন। আমি লালবাজারে আমার জানা অফিসারদের সাহায্যে একটা ব্যবস্থা করতে পারব।...আমরা রাতের ট্রেনে যাচ্ছি।

॥ দুই ॥

কোনও অভিযানে বেরুনোর আগে লক্ষ করেছি কর্নেল কতকগুলো কাজ করেন। যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার পুলিশ কর্তাদের জানিয়ে যান। এটা স্বাভাবিক, কারণ খুনি হোক বা অপরাধী হোক, রহস্যের পরদা তুলে তিনি তাকে দেখিয়ে দিতে পারেন। তাই বলে তাকে গ্রেফতারের ক্ষমতা তো তাঁর নেই। তাই পুলিশ ছাড়া তাঁর চলে না। এদিকে আর-একটা সমস্যা, তাঁর নিজের চেহারা এবং বয়স নিয়ে। রহস্যের পেছনে ছোটা মানে গোয়েন্দাগিরি করা। কর্নেল অঙ্ক কষে রহস্য আঁচ করতে পারেন বটে, কিন্তু সব তথ্য জোগার করতে একজন চালাক-চতুর অভিজ্ঞ লোক দরকার। সেই জন্যই অনেক সময়ই তিনি প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং বর্তমানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার হালদার অর্থাৎ হালদারমশাইকে সঙ্গে নেন। আর আমি তো নেহাত সাংবাদিক! কর্নেলের কীর্তিকলাপ রোমাঞ্চকর করে লিখি বটে, কিন্তু কোনও রহস্যময় ঘটনার সূত্র খুঁজে বের করা আমার সাধ্য নয়।

আরও একটা কথা বলে রাখা দরকার, এ-ধরনের অভিযানে বেরুতে হয় বলে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে আমার জন্য একটা ঘর বরাদ্দ আছে। সেখানে পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে দাড়ি কাটার ব্লেড, টুথব্রাশ আর পেস্ট সবই থাকে। কাজেই আমার আর সল্টলেকের ফ্ল্যাটে ফেরা হল না। কর্নেল নীচের তলায় আমার গাড়ি রাখার জন্য একটা গ্যারেজও খালি রেখেছেন। একসময় সেখানে তাঁর একটা ল্যান্ড রোভার গাড়ি ছিল। পুরোনো গাড়ির ঝামেলা অনেক, তাই সেটা লোহা-লক্কড়ের দামে বেচে দিয়েছিলেন।

দুপুরে খাওয়ার পর আমার ভাত-ঘুমের অভ্যাস আছে। ড্রইংরুমের একটা ডিভানে যথারীতি শুয়ে পড়েছিলুম! কর্নেল তাঁর অভ্যাসমতো ইজিচেয়ারে বসে চুরুট টানছিলেন। তারপর একবার কানে গিয়েছিল টেলিফোনে চাপাস্বরে কার সঙ্গে কথা বলছেন।

আমার ভাত-ঘুম ভেঙে ছিল ষষ্ঠিচরণের ডাকে। তার হাতে চায়ের কাপ-প্লেট! দেখলুম কখন আমার গায়ের ওপর কেউ একটা হালকা কম্বল চাপিয়ে দিয়ে গেছে। তার মানে আমার ঘুমটা যাতে ভালো হয়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উঠে বসে ষষ্ঠির হাত থেকে চা নিয়ে বললুম,—আমার গায়ে এই মড়ার কম্বল চাপাল কে?

ষষ্ঠি খি-খি করে হেসে উঠল। বলল,—বাবামশাই আড়াইটেতে বেরিয়ে গেছেন। যাওয়ার সময় উনিই কম্বলটা আপনার গায়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। আর-একটা কাজ করেছেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম,—তুমি না-বললেও বুঝেছি। আমার প্যান্টের পকেট থেকে গাড়ির চাবি চুরি করে কোথাও উধাও হয়েছেন।

ষষ্ঠি আরও হেসে বলল,—বাবামশাই বলে গেছেন, ঠিক চারটেয় তোর দাদাবাবুকে চা দিবি। আমি তো জানি, আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে বাসিমুখে চা খান। আবার দুপুরে ঘুমুলেও বিছানায় বসে আপনার চা খাওয়ার অভ্যেস আছে।

কথাটা বলে ষষ্ঠিচরণ হন্তদন্ত চলে গেল। বুঝতে পারলুম সে ছাদের বাগানে কাক তাড়াতে যাচ্ছে। কারণ এই শীতের বিকেলে পাশের বাড়ির একটা নিমগাছে কাকেরা ঝগড়া করে। আবার ঝগড়া করতে-করতে ঝাঁক বেঁধে এসে কর্নেলের সাধের বাগানে হামলা করে। সেখানে বিচিত্র প্রজাতির অর্কিড, ক্যাকটাস আর কিম্ভূত-কিমাকার সব বনসাই আছে। ষষ্ঠি হালদারমশাইয়ের পরামর্শে একটা কাকতাড়ুয়া তৈরি করেও কাকের উৎপাত থামাতে পারেননি। এ-হল গিয়ে কলকাতার কাক, কাজেই ষষ্ঠির এখন কাকের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময়।

চা খাওয়ার পর আমি নিজেই কিচেনে গিয়ে চায়ের কাপ-প্লেট রেখে এলুম। তারপর ভাবলুম ছাদের বাগানে ষষ্ঠির যুদ্ধ দেখতে যাব, কিন্তু সেই সময় ডোরবেল বেজে উঠল। কিচেনের পেছন দিয়ে গিয়ে একটা করিডর দিয়ে হেঁটে সদর দরজায় গেলুম। আইহোল-এ চোখ রেখে দেখলুম, হালদারমশাই

এসে গেছেন।

এই দরজায় যে ল্যাচ-কি সিসটেম আছে, তাতে ভেতর থেকে দরজা খোলা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে দরজা খুলতে হলে চাবি চাই। আমি দরজা খুলে দিলে হালদারমশাই সহাস্যে বললেন,—ষষ্ঠি গেল কই?

বললুম,—ষষ্ঠি এখন ছাদের বাগানে কাকের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

এই দরজা দিয়ে ঢুকলে ডানদিকে ডাক্তারবাবুদের যেমন রোগিদের জন্য ছোট্ট ওয়েটিংরুম থাকে, তেমনি ছোট্ট একটা ঘর আছে। এই ঘর দিয়ে এগিয়ে গেলে ড্রইংরুম।

আমার সঙ্গে ড্রয়িংরুমে ঢুকে হালদারমশাই বললেন,—কর্নেলস্যার গেলেন কই? তিনিও কি কাকের লগে ফাইট করতে গেছেন?

বললুম,—না, আমি যখন ভাত-ঘুম দিচ্ছিলুম তখন উনি আমার গাড়ি চুরি করে নিপাত্তা হয়ে গেছেন।

গোয়েন্দাপ্রবর খিল-খিল করে হেসে সোফায় বসলেন। দেখলুম তিনি একেবারে সেজেগুজেই এসেছেন। গায়ে অবশ্য হাতকাটা সোয়েটার, কিন্তু হাতে ভাঁজ করা একটা জ্যাকেটও আছে। আর আছে তার কাঁধে ঝোলানো একটা পুষ্ট পলিব্যাগ।

বললুম,—কর্নেল বলছিলেন ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যা সাড়ে-ছ'টায়। তবে ডিসেম্বরে সাড়ে-ছ'টা মানে রাত বলাই ভালো।

হালদারমশাই সায় দিয়ে বললেন,—হ! তাই দেরি করলাম না।

বলে তিনি কণ্ঠস্বর চেপে জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা জয়ন্তবাবু, আপনার কি মনে হয় কালিকাপুরের চাটুজ্যে বাড়িতে এমন কোনও দামি জিনিস আছে, যেটা হাতানোর জন্য অগো কেউ ভয় দ্যাখাইতাসে!

বললুম,—সেটা আপনি সেখানে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করে জেনে নেবেন।

বলে আমি সুইচ টিপে ঘরের আলো জেলে দিলুম। কারণ, শীত না পড়লেও অন্ধকার নামতে দেরি করেনি। ওদিকে ততক্ষণে ষষ্ঠিচরণও ছাদ থেকে নেমে এসেছে।

হালদারমশাই বললেন,—কর্নেলস্যার আইলে তখন কফি খামু—কি কন?

আমি সায় দেওয়ার আগেই ড্রইংরুম-সংলগ্ন সেই ছোট্ট ওয়েটিং-রুমে কর্নেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম,—আমি এসে পড়েছি হালদারমশাই। আর ষষ্ঠিটাও আমাকে করিডোরের ওদিক থেকে উঁকি মেরে দেখে ফেলেছে। আমি

ভেবেছিলুম চুপিচুপি ঘরে ঢুকে ষষ্ঠিকে চমকে দেব। কিন্তু সে সম্ভবত ছাদের বাগান থেকেই জয়ন্তের গাড়িটা দেখতে পেয়েছিল।

গোয়েন্দাপ্রবর ফিক করে হেসে বললেন,—জয়ন্তবাবু কইসিলেন আপনি ওনার গাড়ি চুরি করসেন।

কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হেসে ইজিচেয়ারে বসলেন। তারপর আমার গাড়ির চাবিটা বের করে টেবিলে রাখলেন।

জিগ্যেস করলুম,—আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এমন জায়গায় গিয়েছিলেন যেখানে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে অসুবিধে হত, কাজেই জিগ্যেস করছি না কোথায় এবং কেন গিয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন,—না, তোমাকে নিয়ে গেলে অসুবিধে হত না, কিন্তু তোমার সুনিদ্রা ভাঙাতে চাইনি।

ষষ্ঠিচরণ ট্রেতে কফির পট, দুধ, চিনি, চায়ের পেয়ালা আর এক প্লেট চানাচুর রেখে গেল। কর্নেল বললেন,—হিস-হিস, হুস-হুস—সব নিজের-নিজের কফি তৈরি করে নাও। হালদারমশাই তো স্পেশাল কফি খান। কাজেই স্বাবলম্বি হওয়াই ভালো। আমরা নিজের-নিজের কফি তৈরি করে নিলুম, হালদারমশাই একটু বেশি দুধ মেশানো কফি অভ্যাস মতো ফুঁ দিয়ে-দিয়ে চুমুক দিতে থাকলেন।

আমি বললুম,—আপনি বলছিলেন সাড়ে-ছ'টায় ট্রেন। এখন পাঁচটা বেজে গেছে। অন্তত এক ঘণ্টা আগে বেরুনো উচিত।

কর্নেল আমার কথার কোনও জবাব দিলেন না। তিনি কফি পান করতে-করতে বুক পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। তারপর সেটা এক হাতেই খুলে টেবিলে রাখলেন। তার ওপর পেপারওয়েটের মতো আমার গাড়ির চাবিগুলো চাপা দিলেন। লক্ষ করলুম হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে কাগজটার দিকে তাকিয়ে আছেন। বললুম,—ওই কাগজটা কোথাও আনতে গিয়েছিলেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। ওতে কালিকাপুরের চ্যাটার্জি ফ্যামিলির পূর্ব-পুরুষের লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের খবর আছে।

কথাটা শোনামাত্র হালদারমশাই এত জোরে নড়ে বসলেন, যে তাঁর পেয়ালা থেকে খানিকটা কফি ছিটকে তাঁর প্যান্টের ওপর পড়ল। তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন,—কী কইলেন? কী কইলেন?

কর্নেল তেমনই গম্ভীর মুখে বললেন,—গুপ্তধনের সন্ধান।

হালদারমশাই আমার দিকে ঘুরে বসে বললেন,—ঠিক এই কথাটাই আমার মাথায় আইজ সারা দিন মাসির মতন ভনভন করত্যাসিল।

আমি হাসি চেপে বললুম,—হালদারমশাই, এ-গুপ্তধনটা কর্নেলকে ফাঁকি দিয়ে আপনি আর আমি দুজনে ভাগাভাগি করে নেব—কি বলেন?

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না। তেমনই গম্ভীর মুখে বললেন,—তবে গুপ্তধন সব সময়েই যে ধনরত্ন হবে, এমন কিন্তু নয়। একটা খুব পুরোনো, ধরো পাঁচশো বছরের কোনও সাধারণ জিনিসকেও গুপ্তধন বলা যায়।

বললুম,—আপনার ওই কাগজটা কিন্তু মোটেই পুরোনো নয়। একটা ছোট্ট প্যাডের একটা স্লিপ বলেই মনে হচ্ছে।

কর্নেল আমার কথায় কান না দিয়ে কফি শেষ করলেন, তারপর চুরুট ধরিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে তাঁর আতস কাচটা বের করলেন। এরপর তিনি টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে আতস কাচের সাহায্যে কাগজের লেখাগুলো খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন,—হ্যাঁ, এতে গুপ্তধনের সূত্র লেখা আছে বটে।

হালদারমশাই ব্যস্তভাবে বললেন,—কী লেখা আছে কন তো কর্নেলস্যার।

কর্নেল কাগজটা আমার হাতে দিলেন। দেখলুম এটা একটা ছোট্ট প্যাডের স্লিপই বটে। তাতে লেখা আছে ঃ

হালদারমশাই উঁকি মেরে দেখছিলেন। বললেন,—অম্ল, মানে টক। তারপর হং, মং—এগুলিন কী?

কর্নেল বললেন,—যিনি এটা আমাকে দিয়েছেন, তাঁর কাছেই পাঁচশো বছরের বেশি পুরোনো একটা তুলোট কাগজে এগুলো লেখা আছে।

আমি অবাক হয়ে বললুম,—এটা কে আপনাকে দিল, তা বলতে আপত্তি আছে?

কর্নেল বললেন,—তুমি দুপুরে যখন স্নান করছিলে, তখন টেলিফোনে এক ভদ্রলোক তাঁর নাম ঠিকানা দিয়ে আমাকে শিগগির যেতে বলেন। আমি যথেষ্ট সতর্ক হয়েই গিয়েছিলুম, তারপর তাঁর পরিচয় পেয়ে বুঝতে পারলুম ইনি কালিকাপুরের চাটুজ্যে পরিবারেরই এক জ্ঞাতি। কালিকাপুরের চণ্ডীপ্রসাদ সিংহ তাঁর বন্ধু এবং ছাত্রজীবনের সহপাঠী ছিলেন। চণ্ডীবাবুই তাঁকে ফোন করে সেখানে যা ঘটেছে তা জানিয়েছেন। চণ্ডীবাবু আমার পরিচয় এবং ফোন নম্বর তাঁকে দিয়ে বলেছেন তাঁর কাছে যে অমূল্য প্রাচীন কাগজটা আছে, তা যেন

আমাকে তিনি দেন। কিন্তু তাঁর টেলিফোন পেয়ে আমি তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলুম তখন তিনি সেই কাগজটা থেকে আমাকে দেবনাগরী লিপিতে লেখা ওই শব্দগুলো টুকে দিলেন। আমি অবশ্য মিলিয়ে দেখে নিয়েছি।

জিগ্যেস করলুম,—ভদ্রলোক কে, কোথায় থাকেন?

কর্নেল বললেন,—তাঁর নাম শরদিন্দু চ্যাটার্জি। থাকেন ভবানীপুরে। তাঁর বাবা থাকতেন কালিকাপুরে। তারপর কলকাতায় আসেন। শরদিন্দুবাবুর নেশা পাখি শিকার করা। আজকাল এসব শিকার নিষিদ্ধ। তবু শীতকালে কালিকাপুরের ওদিকে একটা বিশাল বিলে অনেক দেশি-বিদেশি জলচর পাখি আসে। শরদিন্দুবাবু অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। গোপনে বুনো হাঁস শিকার করতে যান। তবে জ্ঞাতিদের বাড়িতে ওঠেন না। তাঁর আশ্রয় চণ্ডীবাবু। হাঁস শিকার করতে পারলে সেদিনই তিনি তাঁর ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর যাওয়ার কথা ছিল আজ। কিন্তু একটা কাজে আটকে পড়েছেন। তিনি পেশায় একজন আইনজীবী। তাই কোর্টের ছুটি না থাকলে তাঁর কালিকাপুর যাওয়া হয় না।

বললুম,—তাহলে তিনি সেখানে যাচ্ছেন না?

কর্নেল বললেন,—আর কয়েকদিন পরেই তো বড়দিন—পঁচিশে ডিসেম্বর, কাজেই তার আগের দিন তিনি সন্ধ্যার ট্রেনে যাবেন।

হালদারমশাই টান হয়ে শুয়েছিলেন। বললেন,—এই ভদ্রলোকেরে আমার সন্দেহ হইত্যাসে। আইনজীবী হইয়াও তিনি আইন ভঙ্গ করেন।

কর্নেল এতক্ষণে একটু হাসলেন। বললেন,—আপনি কি তিনটে দিন অপেক্ষা করে শরদিন্দুবাবুর গতিবিধির দিকে লক্ষ রাখবেন? তারপর না হয় ওঁকে ফলো করেই কালিকাপুরে যাবেন।

হালদারমশাই কাঁচুমাচু হেসে বললেন,—নাঃ, যখন বাড়াইয়া পরসি তখন আর কোনও কথা না। তেমন বুসলে আমি কালিকাপুরে থাইক্যা যামু।

এইসব কথাবার্তা হতে-হতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। তারপর কর্নেল কাগজটা নিজের পকেটে ভরে বললেন,—জয়ন্ত এই তোমার গাড়ির চাবি আমি আলমারির লকারে রেখে যাব। যাও তুমি রেডি হয়ে নাও। এই সময়টা রাস্তায় বড্ড জ্যাম হয়। হাতে সময় রেখে বেরুনোই ভালো। তা ছাড়া লোকাল ট্রেন। আমার টিকিট কাটার দরকার হয় না। কিন্তু তোমাদের দুজনের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করতে হবে।

হালদারমশাই আড়ামোড়া দিয়ে সোফায় হেলান দিলেন। কর্নেল তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আর আমি ঢুকলুম আমার জন্য সংরক্ষিত ঘরে। শীতকাল বলে আমার ঘরে বাড়তি জ্যাকেট সোয়েটার, কান-ঢাকা টুপি—সবই রাখা ছিল। তবে আমার পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের সিক্স রাউন্ডার রিভলভারটা ছিল আমার হ্যান্ড ব্যাগে। ওটা সবসময়েই কর্নেলের উপদেশে আমি সঙ্গে রাখি। একটা বাড়তি ব্যাগে দরকারি জিনিসপত্র পোশাক-আশাক ভরে নিয়ে আমি ড্রইংরুমে এলুম। তারপর এলেন কর্নেল। আর কর্নেলের গলায় দেখলুম যথারীতি বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছে। তাঁর পিঠে আঁটা কিটব্যাগ, আর হাতে একটা পুষ্ট মোটাসোটা ব্যাগ।

বেরুতে যাচ্ছি টেলিফোনটা বাজল। বিরক্ত হয়ে কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। তারপর কাকে কৌতুক করে বললেন.—হ্যাঁ বলি হতেই তো যাচ্ছি দাদা!

হালদারমশাই চমকে উঠে বললেন,—কেডা কী কইল?

কর্নেল বললেন,--ও কিছু না, চলুন।

॥ তিন ॥

সে-রাতে কালিকাপুর স্টেশনে যখন ট্রেন পৌঁছেছিল, তখন টের পেয়েছিলুম শীত কাকে বলে! প্রচণ্ড কনকনে শীতের রাতটা সত্যিই একটা অ্যাডভেঞ্চারের পরিবেশ তৈরি করেছিল। কারণ, কর্নেলের বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় কেউ হুমকি দিয়েছিল। কাজেই আমি চারদিকে সতর্ক চোখে লক্ষ করছিলুম। কর্নেল অবশ্য নির্বিকার। হালদারমশাই লোকের ভিড় ঠেলে যেতে-যেতে একবার বলেছিলেন,—কী কাণ্ড! কলকাতায় ফ্যান চলত্যাসে, আর এখানেও ফ্যান চলত্যাসে।

এই ধাঁধার জবাব পেলুম একটু ফাঁকায় গিয়ে। নীচের চত্বরে সাইকেলরিকশা, এক্কাগাড়ি আর বাস—এইসব যানবাহনের ভিড়। হালদারমশাইকে জিগ্যেস করেছিলুম,—কলকাতা আর এখানে ফ্যান চলছে বলছিলেন—ব্যাপারটা কী?

হালদারমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—বুজলেন না, ওখানে চলত্যাসে ইলেকট্রিক ফ্যান আর এখানে চলত্যাসে নেচারের ফ্যান।

এতক্ষণে লক্ষ করেছিলুম কথা বলতে গেলেই মুখ দিয়ে বাষ্প বেরুচ্ছে। কর্নেল এদিক-ওদিক ঘুরে চণ্ডীবাবুর পাঠানো গাড়ি খুঁজছিলেন। একটু পরেই যাত্রীদের নিয়ে সব যানবাহন চলে গেল, কিন্তু কোনও প্রাইভেট গাড়ি চোখে পড়ল না।

কর্নেল বললেন,—আবার কোনও গন্ডগোল হয়নি তো? চণ্ডীবাবুর গাড়ি দেখছি না কেন?

হালদারমশাই বললেন,—কর্নেলস্যার, এই শীতে মাটির ভাঁড়ে চা খাইয়া লই। গাড়ি ঠিক আইয়্যা পড়বে।

হালদারমশাই চায়ের দোকানের দিকে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় হর্ন দিতে-দিতে একটা মেরুন রঙের প্রাইভেট গাড়ি এসে আমাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ড্রাইভার নেমে কর্নেলকে সেলাম ঠুকে বলল,—পথে একটু দেরি হয়ে গেছে স্যার। বেশি ঠান্ডার গাড়ির ইঞ্জিন ঠিক মতো কাজ করছিল না। এখন ঠিক হয়ে গেছে, আপনারা উঠে পড়ুন।

কর্নেল সামনের সিটে এবং আমরা দুজনে পেছনের সিটে বসলুম। তারপর ড্রাইভার গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে স্পিড বাড়াল। জানলার কাচ তোলাই ছিল, তবু কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় জবুথবু হয়ে বসে থাকলুম। রাস্তাটা তত ভালো নয়, তাই ঝাঁকুনির চোটে অস্থির হচ্ছিলুম। দু-ধারে সারবন্ধ গাছপালা হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল ড্রাইভারের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছিলেন, কিন্তু সেদিকে আমার কান ছিল না। কেন যে আমি পুরু জ্যাকেটটা পরে আসিনি! তার বদলে এই হালকা জ্যাকেট আর ভেতরে একটা পাতলা সোয়েটার এখানকার শীতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মিনিট পনেরো পরে লক্ষ করলুম, সামনে গাছপালার ফাঁকে গাঢ় কুয়াশার ভেতরে জোনাকির মতো আলো দেখা যাচ্ছে। জনপদের ভেতর ঢুকে শীতের কামড়টা একটু কমে এল। এটা বাজার এলাকা। এত রাত্রে জনমানবহীন হয়ে আছে। তারপর বাঁক নিয়ে ক্রমাগত এদিক-ওদিক ঘুরতে-ঘুরতে যেখানে পৌঁছুলুম সেদিকটায় রাস্তার আলো নেই। কিন্তু একটা বাড়ির গেটে আলো জ্বলছিল। দারোয়ান গেট খুলে দিল। তারপর লন দিয়ে এগিয়ে গাড়ি পোর্টিকোর তলায় থামল। আমরা নিজের-নিজের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে গাড়ি থেকে নামলুম।

ততক্ষণে কর্নেলও নেমেছেন। দেখলুম সিঁড়ির মাথায় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ে সোয়েটার এবং পরনে প্যান্ট। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রায়

কর্নেলের বয়সি। এই ভদ্রলোকের মুখে অবশ্য দাড়ি নেই, তবে দেখার মতো গোঁফ আছে। মাথার চুলও সাদা। তিনি কয়েক ধাপ নেমে এসে কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করলেন। তারপর বললেন,—আমি ভাবছিলুম ট্রেন লেট করেছে।

ড্রাইভার গাড়ির ভেতর থেকে বলে উঠল,—না স্যার, পথে ইঞ্জিন গোলমাল করছিল। কালকে একবার গ্যারেজে দেখিয়ে আনতে হবে।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করে বললেন,—আসুন।

ভেতরে একটা প্রশস্ত ঘর। সেকেলে আসবাবপত্র। এ-ধরনের বনেদি ধনী পরিবারের বাড়ি কর্নেলের সঙ্গগুণে আমার দেখা আছে। তাঁকে অনুসরণ করে আমরা দরজা দিয়ে করিডোরে ঢুকলুম। এতক্ষণে চোখে পড়ল একটা গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার লোক করিডোরের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারা প্রচণ্ড কালো। সে দু-হাত জোড় করে সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, —কর্নেলসাহেবকে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনি আসবেন শোনার পর থেকেই আমি শুধু অপেক্ষা করছিলুম। কর্তামশাই আমাকে নন্দ-ড্রাইভারের সঙ্গে স্টেশনে যেতে দিলেন না।

চণ্ডীবাবু কপট ধমক দিয়ে বললেন,—এই কেতো, যাত্রাদলের পার্ট করবি, না সাহেবদের ঘরে নিয়ে যাবি?

সে পাশের একটা ঘরের পরদা সরিয়ে বলল,—সবকিছু রেডি কর্তামশাই। সাহেবরা বসুন, আমি ঠাকুরমশাইকে দেখি।

চণ্ডীবাবু বললেন,—এক মিনিট। কর্নেলসাহেব এত রাতে কি আর কফি খাবেন?

কর্নেল বললেন,—খাব। তবে ডিনারের পরে। কার্তিক, তুমি ঠাকুরমশাইকে কথাটা মনে করিয়ে দিয়ো।

মোটামুটি প্রশস্ত একটা সাজানো-গোছানো ঘরে আমরা ঢুকেছিলুম। দু-ধারে দুটো খাট। একপাশে সোফা। চণ্ডীবাবু কোণের একটা চওড়া টেবিল দেখিয়ে বললেন,—ব্যাগগুলো ওখানে রেখে কর্নেলসাহেব আরাম করে বসুন। আপনার ইজিচেয়ারটা কিন্তু আমি ওপর থেকে আনিয়ে রেখেছি।

কর্নেল তাঁর পিঠে-আঁটা কিটব্যাগটা খুলে টেবিলে রাখলেন। তারপর ক্যামেরা এবং বাইনোকুলারটা একপাশে রেখে দিলেন। তিনি ইজিচেয়ারে বসে মাথার টুপিটা খুলে দেওয়ালের একটা ব্র্যাকেটে আটকে দিলেন। তারপর

ইজিচেয়ারে বসে চওড়া টাকে হাত বুলোতে থাকলেন।

ততক্ষণে আমরা সোফায় বসেছি। ঘরের ভেতরটা বেশ আরামদায়ক।

চণ্ডীবাবু বললেন,—একটা রুম হিটার আছে, জ্বেলে দেবো নাকি?

কর্নেল বললেন,—না মিস্টার রায়চৌধুরী। আমার সঙ্গীদের একটু শীতের আরাম পাওয়া দরকার। কলকাতায় এখনও ফ্যান চালাতে হচ্ছে।

চণ্ডীবাবু সোফার একপাশে বসে বললেন,—উনি আপনার তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী, তা বোঝা যাচ্ছে। আর ইনিই সেই প্রাক্তন পুলিশ অফিসার এবং প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিস্টার কে কে হালদার। কি? আমি ভুল করিনি তো?

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন,—নাঃ, আপনি ঠিক ধরসেন। তবে একসময় আমি পুলিশ লাইফে অনেক গ্রামে ঘুরসি, কিন্তু আপনাগো এখানে এত শীত ক্যান?

চণ্ডীবাবু বললেন,—শীত বদলায়নি। আসলে বদলে গেছেন আপনি। কলকাতায় থাকলে মানুষের অনেক অদলবদল ঘটে যায়।

কর্নেল বললেন,—আচ্ছা মিস্টার রায়চৌধুরী, চাটুজ্যে বাড়ির কেস সম্পর্কে পুলিশ কতদূর এগিয়েছে? আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

চণ্ডীবাবু বললেন,—লালবাজার থেকে আপনার সুপারিশে পুলিশ একটা কুকুর এনেছিল। সান্ডেলটা শুঁকিয়ে কুকুরটাকে শুনেছি কাজে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু কুকুরটা পুকুরের পাড় দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা গলি রাস্তায় গিয়েছিল। তারপর আর সে কোনওদিকে এগোয়নি। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি ওই গলির পাশে একটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ম্যাটাডোরে বোঝাই করে বাড়ির মালমশলা নিয়ে আসা হচ্ছে। তাই পুলিশের সন্দেহ খুনিরা বা খুনি ওই ম্যাটাডোরে চেপে পালিয়ে গেছে।

হালদারমশাই বলে উঠলেন,—পুলিশ ম্যাটাডোরের ড্রাইভার বা যার বাড়ি হইত্যাসে তাগো জেরা করে নাই?

চণ্ডীবাবু একটু হেসে বললেন,—জেরা করেছে, কিন্তু কোনও সূত্রই বেরিয়ে আসেনি। অবশ্য এমন হতেই পারে প্রাণের ভয়ে ড্রাইভার মুখ খুলতে চায়নি।

কথাটা বলে তিনি ঘড়ি দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—আপনারা বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নিন। গরম জলের ব্যবস্থা

আছে। আমি দেখি, খাওয়ার ব্যবস্থা কতটা হল।

তিনি বেরুবার আগেই কার্তিক এসে গেল। সে বলল,—সব রেডি স্যার। আপনারা এখনই আসুন। যা শীত পড়েছে খাবার গরম থাকছে না।

নীচের তলায় ডাইনিংরুমে খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা গেস্টরুমে ফিরে এলুম। তারপর কার্তিক এসে বলল,—একজনের শোওয়ার ব্যবস্থা পাশের ঘরেই হয়েছে। এই ঘর থেকে যাওয়া যায়। ওই দেখুন দরজা।

হালদারমশাই টেবিল থেকে তাঁর ব্যাগ তুলে নিয়ে একটু হেসে বললেন, —আমি ওই ঘরে যাই।

কর্নেল বললেন,—যান, কিন্তু সাবধান। এ-বাড়িতেও ভূতের উৎপাত আছে। বাইরের দিকে কেউ কড়া নাড়লে যেন দরজা খুলে বেরুবেন না।

কার্তিক হালদারমশাইকে আমাদের ঘরের মাঝের দরজা দিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সে হালদারমশাইকে সব দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে চলে গেল।

চণ্ডীবাবু পাইপ টানছিলেন। আর কর্নেল অভ্যাসমতো কফি পান করছিলেন। আমি পুরু কম্বলের তলায় ঢুকে পড়েছিলুম। দুজনে চাপা গলায় কথা বলছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলুম না। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

সেই ঘুম ভেঙেছিল কার্তিকের ডাকে। তার হাতে চায়ের কাপ-প্লেট দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম কর্নেলের নির্দেশ সে পালন করছে। সে আমার হাতে চায়ের কাপ-প্লেট তুলে দিয়েই বলল,—আমার কর্তামশাইয়ের সঙ্গে কর্নেলসাহেব আর হালদারসাহেব ভোরবেলা বেরিয়ে গেছেন। কিছু দরকার হলে আমি আছি। ওই বেলটা টিপবেন, তাহলেই আমি এসে যাব।

ঘড়িতে দেখলুম সাড়ে সাতটা বাজে। উলটোদিকের জানলা খোলা। পরদার ফাঁকে ম্লান রোদের আভা। কার্তিক বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি বেড-টি খাওয়ার পর উলটোদিকের দরজা খুলে দেখলুম, এদিকে টানা বারান্দা। আর নীচে রং-বেরঙের ফুলের গাছ। তখনও রোদের সঙ্গে কুয়াশা মিশে আছে। বাউন্ডারি ওয়ালের উঁচু পাঁচিল দেখা যাচ্ছিল। পাঁচিলের ধারে সারবদ্ধ গাছ। কিন্তু ঠান্ডায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানো গেল না।

কর্নেলরা যখন ফিরে এলেন, তখন প্রায় ন'টা বাজে। অভ্যাসমতো কর্নেল বললেন,—মর্নিং জয়ন্ত। আশাকরি কোনও অসুবিধে হয়নি?

বললুম,—না। আপনাদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। আপনারা কি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন?

হালদারমশাই এসেই নিজের ঘরে ঢুকেছিলেন। কর্নেল কিছু বলার আগে তিনি দ্রুত ফিরে এসে ধপাস করে সোফায় বসে বললেন,—আরে কী কাণ্ড!

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে টুপি, বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা গলা থেকে খুলে পাশের টেবিলে রাখলেন। তারপর বললেন,—হ্যাঁ কাণ্ডই বটে। তবে একটা কথা আপনাকে বলা দরকার হালদারমশাই। অমন করে যেখানে-সেখানে ফায়ার আর্মস বের করবেন না।

গোয়েন্দাপ্রবর কাঁচুমাচু হেসে বললেন,—হ! উচিত হয় নাই। আসলে আমাগো ভূতের ভয় দেখাইতে চায়—এত সাহস!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হ্যাঁ। আপনি একসময় পুলিশ অফিসার ছিলেন, আপনার রাগ হওয়ারই কথা। তবে ভাগ্যিস ঢিলগুলো সেইরকম নুড়ি-পাথর নয়! তাহলে আমাদের চোট লাগত।

জিগ্যেস করলুম,—ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন,—গঙ্গার ধারে বাঁধের পথে আমরা যাচ্ছিলুম। হঠাৎ গাছপালার আড়াল থেকে ঢিল এসে পড়তে শুরু করল। তবে মাটির ঢিল। গঙ্গার ধারের মাটি খুব নরম, তাই ঢিলগুলো ভেঙে যাচ্ছিল। চণ্ডীবাবু ছিলেন আগে। তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। আর হালদারমশাই রিভলভার বের করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।

বলে কর্নেল তাঁর অনুকরণ করে শোনালেন,—কোন হালা রে! দিমু মাথার খুলি ঝাঁঝরা কইর‍্যা। শুধু তাই নয়, তিনি বাঁধ থেকে নেমে ঝোপজঙ্গল ভেদ করে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁকে চণ্ডীবাবুই পেছন থেকে টেনে ধরেছিলেন। আর জায়গাটা কোথায় জানো? কালিকাপুরের শ্মশান। তাই ওখানে কোনও বসতি নেই। তা ছাড়া, গঙ্গার ভাঙন রোধে বনদপ্তর থেকে বাঁধের নীচে একটা শালবনও গড়ে তোলা হয়েছে।

হালদারমশাই যে মনে-মনে ক্ষুব্ধ তা বুঝতে পারছিলুম। তিনি নস্যির কৌটো বের করলেন। কিন্তু তখনই কার্তিক একটা বিশাল ট্রেতে কফি এবং স্ন্যাক্স এনে রাখল। তার পেছনে এলেন চণ্ডীবাবু।

কার্তিক চলে গেল। আমরা কফি পানে মন দিলুম। একসময় চণ্ডীবাবু হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,—মিস্টার হালদারকে আমি যদি না-আটকাতুম,

তাহলে উনি নিশ্চয়ই এক রাউন্ড ফায়ার করে অন্তত একটা ভূতকে ধরাশায়ী করতেন।

হালদারমশাই বললেন,—ঠিক কইসেন। একখান গুলি অন্তত একজন ভূতের হাঁটুর নীচে লাগত।

চণ্ডীবাবু বললেন,—ওই ঘন কুয়াশার মধ্যে আপনারও কিন্তু বিপদের আশঙ্কা ছিল।

কর্নেল বললেন,—একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে মিস্টার রায়চৌধুরী। কলকাতা থেকেই কেউ বা কারা আমাদের অনুসরণ করেছে। রাত্রে আমরা গাড়িতে আসায় তারা সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমাদের একটু সতর্ক থাকা ভালো।

হালদারমশাই বললেন,—আর শচীনবাবুও যেন কেমন বদলাইয়া গেসেন। কলকাতায় ওনাকে মনে হইত্যাসিল খুব সরল মনের মানুষ। কিন্তু এখানে মনে হইল য্যানো কিছু গোপন করবার চেষ্টা করত্যাসেন।

চণ্ডীবাবু জিগ্যেস করলেন,—আপনি অভিজ্ঞ মানুষ, ঠিকই ধরেছেন। ওই শচীনই আমাকে ওর জ্ঞাতি অ্যাডভোকেট শরদিন্দুবাবুর কাছে রক্ষিত ওদের পূর্বপুরুষের একটা দলিলের কথা বলত। কিন্তু কর্নেলসাহেব যখন জানতে চাইলেন উনি কেন নিজে সেটা শরদিন্দুবাবুর কাছে সচক্ষে দেখতে চাননি, তখন শচীন ন্যাকা সেজে বলল ওটা তেমন কিছু নয়। তার বাবা নাকি বলেছে ওটার কোনও মূল্যই নেই।

কর্নেল বলে উঠলেন,—হ্যাঁ, শচীনবাবুর কথাটা আমাকেও অবাক করেছে। আমি যখন ওঁকে সেই কাগজটা দেখিয়ে বললুম, এটা তিনি চেনেন কি না, এবং এও বললুম, এটা তাঁদের সেই পূর্বপুরুষের রক্ষিত কাগজে যা লেখা আছে তার কপি, তখন শচীনবাবু একবার চোখ বুলিয়েই বললেন. এটা বাজে। আসল কাগজটা নাকি শরদিন্দুবাবু আমাকে দেখাননি।

এই সময় কার্তিক পরদার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বলল,—কর্তামশাই, আপনার টেলিফোন এসেছে।

চণ্ডীবাবু তখনই তাঁর কফির কাপে প্লেট ঢাকা দিয়ে আসছি বলে দ্রুত চলে গেলেন।

হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন,—আমার ধারণা, চণ্ডীবাবু আমাগো সঙ্গে থাকায় শচীনবাবু হয়তো মন খুইল্যা কথা কইতে পারেন নাই। কর্নেলস্যার

যদি আমারে একা শচীনবাবুর লগে দেখা করতে কন আমি যামু।

কর্নেল বললেন,—যেতে পারেন, কিন্তু খুব বেগতিক না দেখলে যেন রিভলভার বের করবেন না।

একটু পরে চণ্ডীবাবু ফিরে এসে বললেন,—থানা থেকে ওসি প্রণবেশবাবু ফোন করেছিলেন। উনি কর্নেলসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন।

॥ চার ॥

ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। চণ্ডীবাবু নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে চললেন। কর্নেল তাঁর অভ্যাসমতো সামনের সিটে বসলেন। আমি এবং হালদারমশাই ব্যাক সিটে বসলুম। এই এলাকাটা নিরিবিলি নির্জন। ঘন বসতি এলাকায় পৌঁছে হালদারমশাই বলে উঠলেন,—মিস্টার রায়চৌধুরী, আমারে এখানেই নামাইয়া দেন।

কর্নেল কিছু বললেন না। কিন্তু চণ্ডীবাবু বললেন,—আপনি কি চাটুজ্যে বাড়ি যেতে চান?

হালদারমশাই বললেন,—হ! আমি একবার নিজের বুদ্ধিতে পা ফালাইয়া দেখতে চাই।

আমি বললুম,—দেখবেন, আড়াল থেকে ভূতের হাতের ইট-পাটকেল যেন না এসে পড়ে।

গোয়েন্দাপ্রবর হাসি মুখে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। এখন তাঁর মাথায় হনুমান টুপি নেই। গলা-বন্ধ পুরু সোয়েটার আর প্যান্ট পরা ঢ্যাঙা মানুষটি ঠিক পুলিশের ভঙ্গিতেই এগিয়ে গেলেন।

চণ্ডীবাবু গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললেন,—যাই বলুন কর্নেলসাহেব, মিঃ হালদার খুব সাহসী মানুষ। পুলিশ জীবনে উনি সম্ভবত আরও জেদি আর দুঃসাহসী ছিলেন।

কর্নেল বললেন,—ওঁকে নিয়ে একটাই সমস্যা। অনেক সময়েই উনি ভুলে যান যে উনি এখন আর পুলিশ অফিসার নন।

বাজার এলাকা পেরিয়ে বাঁ-দিকে গঙ্গার ধারে এদিকটায় বাঁধের ওপর পিচ রাস্তা করা হয়েছে। সেই রাস্তায় সবরকমের যানবাহন যাতায়াত করছে।

আমাদের ডানদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে গঙ্গার ভাঙন রোধ করার জন্য শাল আর শিশু গাছের ঘন জঙ্গল গড়ে তোলা হয়েছে। এদিকটায় ঘরবাড়িগুলো বেশ সাজানো গোছানো এবং প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে একটা করে ফুলবাগিচা। চণ্ডীবাবু বললেন,—এই দিকটায় নিউ টাউনশিপ গড়ে উঠেছে। এলাকার পয়সাওয়ালা লোকেরা এখানে এসে বাড়ি করেছেন।

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা চওড়া রাস্তায় পৌঁছলুম। দেখলুম ডান দিকে গঙ্গা পারাপারের ঘাট আর বাঁদিকে সেকাল-একালে মেশানো সব দোতলা পাকা বাড়ি। কর্নেল বললেন,—কালিকাপুরের অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সরকারি অফিসগুলোর অবস্থা দেখছি একইরকম। ওই বাড়িটা সেই ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের অফিস না?

চণ্ডীবাবু বললেন,—ওটার পেছনেই থানা। তবে থানার বাড়িটা দোতলা করা হয়েছে এবং অনেকটা ভোল ফেরানো হয়েছে।

গাড়ি আবার বাঁ-দিকে ঘুরে যেখানে দাঁড়াল, সেখানে সামনা-সামনি একটা গেট। গেটটা খোলাই ছিল। ভেতরে গাড়ি ঢুকিয়ে একপাশে পার্ক করলেন চণ্ডীবাবু। পুলিশের জিপ আর বেতার ভ্যান দেখে বুঝতে পারলুম, এটাই থানা। গাড়ি থেকে নেমে কর্নেল এবং চণ্ডীবাবু এগিয়ে গেলেন। আমি নেমে গিয়ে চণ্ডীবাবুকে বললুম,—গাড়ি লক করে এলেন না?

চণ্ডীবাবু একটু হেসে বললেন,—আপনি ঠিকই বলেছেন, লক করে আসা উচিত ছিল। ওসি প্রণবেশবাবু নিজেই বলেন,—থানা থেকে চুরির আশঙ্কা বেশি।

একটা ঘরের জানলা দিয়ে দেখলুম, এক ভদ্রলোক সাদা পোশাকে বসে আছেন। চণ্ডীবাবু আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে বললেন,—এই দেখুন, আপনার সেই কিংবদন্তীখ্যাত ব্যক্তি।

তখনই বুঝতে পারলুম ইনিই ওসি মিস্টার প্রণবেশ সেন। তিনি কর্নেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সকৌতুকে বললেন,—আমি স্বপ্ন দেখছি, না বাস্তব কিছু দেখছি সেটা পরীক্ষা করে নিই।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে দিলে তিনি দু-হাতে হাত চেপে ধরে বললেন,—সত্যি আমার জীবন ধন্য হল। আপনার কথা এতকাল উঁচু তলার অফিসারদের মুখে শুনে আসছি, আপনাকে যে সচক্ষে দর্শনের সৌভাগ্য হবে কল্পনাও করিনি।

কর্নেল সামনের খালি চেয়ারে বসলেন। তাঁর একপাশে চণ্ডীবাবু অন্যপাশে আমি বসলুম। প্রণবেশবাবু আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন,—আপনি নিশ্চয়ই সেই খ্যাতনামা সাংবাদিক, জয়ন্ত চৌধুরী? এবার আপনাকে ছুঁয়ে দেখি।

অগত্যা আমাকেও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে হল।

প্রণবেশবাবু বললেন,—দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় জয়ন্তবাবুর যা রেপোর্টাজ বেরোয়, আমার গিন্নি তা খুঁটিয়ে পড়েন।

এইসব এলোমেলো কথাবার্তার পর ওসি মিস্টার সেনের কোয়ার্টার থেকে একজন কনস্টেবল ট্রেতে কফি আর স্ন্যাকস নিয়ে এল। সে মৃদুস্বরে বলল,—মাইজি সাহেবদের সঙ্গে একবার আলাপ করতে চান।

মিস্টার সেন বললেন,—তোমার মাইজিকে অপেক্ষা করতে বলো। কর্নেলসাহেবরা এসেছেন বিশেষ একটা কাজে।

কনস্টেবল সেলাম ঠুকে চলে গেল।

আমার আর কফি পানের ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য কাপটা তুলে নিতেই হল। কারণ এই কফি যিনি তৈরি করে পাঠিয়েছেন, সেই ভদ্রমহিলা আমার লেখার ভক্ত। ওসি মিস্টার সেন কফিতে চুমুক দিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—ব্লাড রিপোর্টের সারমর্ম আজ সকালেই টেলিফোনে পেয়ে গেছি। ফরেনসিক এক্সপার্টদের মতে রক্তটা মানুষের নয়।

চণ্ডীবাবু চমকে উঠে বললেন,—মানুষের রক্ত নয়? তাহলে কীসের রক্ত?

ওসি একটু হেসে বললেন,—কোনও মানবেতর প্রাণীর রক্ত। যে কারণেই হোক, কেউ বা কারা চ্যাটার্জিবাবুদের ভয় দেখাতে চেয়েছে। ভূতের উৎপাতে ওঁরা ভয় পাচ্ছেন না দেখেই সম্ভবত একটা সাংঘাতিক ঘটনা সাজিয়েছে।

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। চণ্ডীবাবু জিগ্যেস করলেন,—কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, মহীন কোথায় গেল? না কি সে সত্যিই সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছে, এবং তার ঘনিষ্ঠ কোনও লোককে সে সেকথা জানিয়ে গেছে, এবং তার সূত্রেই চাটুজ্যেদের কোনও শত্রু এই সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছে।

ওসি বললেন,—হ্যাঁ। এ-ধরনের অনেক সিদ্ধান্তে অবশ্য আসা যায়, তবে সবার আগে শচীনবাবু কিংবা তাঁর বাবা যদি আমাদের কাছে কোনও কথা না লুকিয়ে খোলাখুলি বলে দেন, তাহলে আমাদের এগোতে সুবিধে হয়।

এতক্ষণে কর্নেল বললেন,—আপনারা নিশ্চয়ই হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই।

ওসি বললেন,—না কর্নেলসাহেব, আমাদের তদন্তের কাজ যথারীতি চলছে।

এই সময়েই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—আজ ভোরে গঙ্গার ধারে, বেড়াতে গিয়ে আপনারা কাদের ঢিল খেয়েছেন! তার মানে—

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—আমরা কারুর ঢিল খাব কেন? আমাদের সঙ্গী হালদারমশাইয়ের হাবভাব দেখে কাচ্চা-বাচ্চারা পাগল বলে ঢিল ছুঁড়তেই পারে।

তখনই বুঝতে পারলুম, কথাটা বলা আমার উচিত হয়নি। কর্নেল খুব দরকার না হলে কোনও কেসে নিজের হাতের তাস পুলিশকে দেখাতে চান না।

এদিকে কর্নেলের কথা শুনে চণ্ডীবাবু হেসে উঠেছিলেন। আর ওসি প্রণবেশ সেনও হাসতে-হাসতে বললেন,—হালদারমশাই মানে সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোক? যার কথা জয়ন্তবাবুর রেপোর্টাজে পড়েছি। তিনি তো রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্সপেক্টর। তো তাঁকে সঙ্গে আনলেন না কেন?

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই এখানকার ঠান্ডায় একেবারে নেতিয়ে গেছেন। তাই শরীর গরম করার জন্য তিনি পায়ে হেঁটে সারা কালিকাপুর ঘুরে দেখতে চান। এতে নাকি তাঁর শরীর আবার গরম হয়ে উঠবে।

প্রণবেশবাবু হেসে উঠলেন। বললেন,—পায়ে হেঁটে কালিকাপুর পুরোটা ঘুরে দেখতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। যাই হোক, এবার একটা সিরিয়াস কথায় আসছি। শচীনবাবু কাল সন্ধ্যায় থানায় এসেছিলেন। উনি বলছিলেন ওঁর বাবা নাকি কিছুদিন থেকে প্রায়ই বলছেন এই বাড়ির ওপর কোনও কুপিত গ্রহের দৃষ্টি পড়েছে। বাড়িটা বেচে দিয়ে নিউ টাউনশিপ এলাকায় যাওয়া উচিত। কিন্তু শচীনবাবুর বক্তব্য ওই এলাকায় জমির দাম অনেক বেশি। তা ছাড়া, ঠাকুরবাড়ি ফেলে রেখে অন্য জায়গায় গেলে গৃহদেবতা রুষ্ট হবেন।

চণ্ডীবাবু বললেন,—ক'দিন আগে আমি শচীনের বাবাকে দেখতে গিয়েছিলুম। অহীনকাকা আমার হাত চেপে ধরে বললেন,—চণ্ডী, এই বাড়ি থেকে আমাদের চলে যাওয়া দরকার। তুমি অন্তত একটা ভাড়ার বাড়িও দেখে দাও আমাদের। আজকাল তো কালিকাপুরে অনেক সরকারি অফিস হয়েছে, অনেকে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে শুনেছি।

আমি অহীনকাকুকে বলেছিলুম,—আপনারা তো এখানে ভালোই আছেন।

এরকম চারিদিক মোটামুটি খোলামেলা বাড়ি কোথাও পাবেন না।

তখন অহীনকাকু চাপাস্বরে আমাকে বললেন,—রোজ রাত্রে বিনোদ পাগলার প্রেত এসে হানা দিচ্ছে। ভয় পাবে বলে শচীন বা আমার ভাই মহীনকে কথাটা বলিনি। চণ্ডীবাবু হাসতে-হাসতে আরও বললেন,—অহীনকাকু নাকি ঘরের ভেতরে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। এমনকি তাঁর বোন বাসন্তিও নাকি রাতদুপুরে স্পষ্ট তাকে দেখেছে। মেয়েদের সাহস বেশি, আর বাসন্তির তো সাহসের সীমা নেই।

ওসি মিস্টার সেন বললেন,—হ্যাঁ, ওই পাড়ায় ভূতের গল্প জোর রটে গেছে। তারপর হঠাৎ এই হাড়িকাঠে রক্তপাত। আফটার অল সব গ্রামের মানুষ তো! সন্ধ্যা হতে-না-হতেই দরজা এঁটে বাড়িতে ঢুকে থাকছে। গত একসপ্তাহ ধরে ওই এলাকায় পুলিশ রাউন্ডে গেছে, কিন্তু রাস্তায় কোনও লোকজন দেখতে পায়নি।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—মিস্টার সেন, তাহলে এবার ওঠা যাক।

ওসি মুখে কৌতুক ফুটিয়ে বললেন,—আপনি কি সরেজমিনে তদন্ত করতে চাটুজ্যে বাড়ি যাবেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—একবার যেতে ইচ্ছে করছে। কারণ আপনার মুখে যে সূত্রটা পেলুম সেটা গুরুত্বপূর্ণ। রক্তটা মানুষের যে নয়, কোনও জানোয়ারের, ওটা যখন জানা গিয়েছে তখন ভূতের উপদ্রব কিংবা মহীনবাবুর অন্তর্ধান রহস্য অন্যদিক থেকে ভেবে দেখার দরকার আছে।

ওসি প্রণবেশ সেন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—কর্নেলসাহেব, পুলিশ সুপার আমাকে না বললেও, আমি আপনাকে সবরকমের সাহায্যের জন্য তৈরি থাকব। শুধু একটা অনুরোধ, একবার আপনি জয়ন্তবাবু এবং মিস্টার হালদারকে আমার গৃহিণীর সামনে উপস্থিত করাবেন। সোজা কথায় বলছি চণ্ডীবাবুসহ আপনাদের তিনজনকে একবার আমার গৃহিণীর হাতের রান্না খেতে হবে।

কর্নেল বললেন,—অবশ্যই। তবে আগে চাটুজ্যে বাড়ির রহস্যটা ফাঁস করতে হবে। আপনার সাহায্যও দরকার হবে। তারপর আপনার নেমন্তন্ন খাওয়া যাবে।

প্রণবেশ সেন আমাদের গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে বিদায় দিলেন। রাস্তায় পৌঁছে আমি বললুম,—ভদ্রলোককে পুলিশ বলে একদমই মনে হল না। অত্যন্ত সরল সাদাসিধে মানুষ।

চণ্ডীবাবু গাড়ির গতি কমিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বাঁকা হেসে বললেন,—জয়ন্তবাবু, আজ অবধি কালিকাপুরে এই ভদ্রলোকের মতো কোনও অফিসার আসেননি। উনি আসার পর একবছরেই এলাকার দাগি অপরাধীরা কেউ জেলে পচছে আবার কেউ এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি এলাকার একজন দাগি অপরাধী কাল্লু মিঞা, সেনসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে-বলতে একেবারে কাপড়ে-চোপড়ে—

চণ্ডীবাবু মুখ ফিরিয়ে হাসতে থাকলেন। কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত এতদিন ধরে আমার সঙ্গে ঘুরে অসংখ্য পুলিশ অফিসার দেখেছে। তবু এখনও ও পুলিশ সম্পর্কে অজ্ঞ।

অনেক অলিগলি ঘুরে আমাদের গাড়ি যেখানে দাঁড়াল, সেখানে কাছাকাছি কোনও বাড়ি নেই। ডানদিকে একটা আমবাগান আর বাঁ-দিকে একটা পুকুর। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে একটা পুরোনো মন্দির। গাড়ি থেকে নেমে বললুম,—আমার ধারণা ওটাই সেই চাটুজ্যে বাড়ির গৃহদেবতার মন্দির।

চণ্ডীবাবু এখানে কিন্তু গাড়ি লক করলেন। ততক্ষণে কর্নেল হনহন করে পুকুরের পাড় দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলুম। মন্দিরের সামনে একটা চত্বর। চত্বরে একটা পশুবলি দেওয়ার হাড়িকাঠ পোঁতা আছে।

হাড়িকাঠে অবশ্য সিঁদুর মাখানো আছে, কিন্তু কোথাও আর রক্তের কোনও চিহ্ন নেই। চণ্ডীবাবু এগিয়ে এসে বললেন,—রক্ত কালই পুলিশ এসে ধুয়ে ফেলেছে। কিছুটা নমুনা অবশ্য নেওয়া হয়েছিল।

মন্দিরের কোনও দরজা দেখলুম না। তবে একটা শিবলিঙ্গ দেখতে পেলুম। কর্নেল মন্দিরের পেছন দিক ঘুরে আমার সামনে এলেন। সেই সময়েই এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা পাশের বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন। চণ্ডীবাবু বললেন,—বাসন্তিদি, চিনতে পারছ, এঁরা কে?

ভদ্রমহিলা করজোড়ে নমস্কার করে বললেন,—পেরেছি বইকি! শচীনের মুখে কর্নেলসাহেবের কথা শুনেছি। আপনারা দয়া করে বাড়ির ভেতরে আসুন।

বুঝতে পারলুম এই দরজা দিয়ে মন্দির এবং চত্বরের নীচে পুকুরের ঘাটে যাওয়া যায়। বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখলুম, একতলা একটা পুরোনো বাড়ি। অন্যপাশে একটা টালির চালের তিনদিক ঘেরা ঘর। ওটা রান্নাঘর।



বাসন্তি দেবী বললেন,—এই সময় আবার শচীন কোথায় বেরুল কে জানে! আপনারা আসুন। শচীনের ঘরেই আপনাদের বসাচ্ছি।

কর্নেল বললেন,—থাক, আমরা বসব না। একটুখানি আপনাদের এই বাড়ি আর পেছন দিকটা ঘুরে দেখব।

কথাটা বলেই কর্নেল হঠাৎ আমাদের অবাক করে রান্নাঘরের পাশে পাঁচিলটার দিকে দৌড়ে গেলেন। তারপর পাঁচিলের ওপর দিয়ে দু-হাতের সাহায্যে উঁচু হয়ে কী দেখলেন। তারপর ফিরে এসে সহাস্যে বললেন,—দিন-দুপুরে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভূতের মুণ্ডু!

চণ্ডীবাবু বললেন,—ভূতের মুণ্ডু মানে! কেউ উঁকি দিচ্ছিল?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। কুৎসিত মুখোস পরা একটা মুখ। আমি তেড়ে

যেতেই অদৃশ্য। অগত্যা দৌড়ে গিয়ে দেখতে হল ভূতের চেহারাটা কীরকম। কিন্তু ততক্ষণে ভূতটা পেছনের ওই ভেঙেপড়া বাড়িটার আড়ালে লুকিয়ে গেল।

বাসন্তিদেবী চোখ বড় করে বললেন,—এত সাহস! কর্নেলসাহেব দয়া করে একটু বসুন।

॥ পাঁচ ॥

বাসন্তি দেবীর অনুরোধে কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে, যদি আপনার কোনও কথা বলার থাকে, এখানে দাঁড়িয়েই বলতে পারেন।

বাসন্তি দেবী বললেন,—দাদা এখন বাথরুমে আছেন। তা না হলে দাদাই বলতেন। ছোড়দা মহীন প্রায়ই বলত, সে আমাদের পূর্বপুরুষের লুকিয়ে রাখা এক ঘড়া সোনার মোহর কোথায় আছে তা জানে, কিন্তু সে-কথা সে জানাতে পারবে না। কারণ, এক রাত্রে স্বপ্নে তাকে তার ঠাকুরদা নাকি দেখা দিয়ে বলেছেন। তুই যা জেনেছিস তা যেন অন্যে জানতে না পারে। অন্যকে তুই মোহরের ঘড়ার খবর দিলে মুখে রক্ত উঠে মরবি। তাই আমাদের ঠাকুরবাড়িতে হাড়িকাঠের পাশে রক্ত দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনে হয়েছিল তাহলে মহীনই হয়তো শচীনকে কথাটা বলে দিয়েছিল। তাই মুখে রক্ত উঠে সে মরেছে। আর শচীন তার লাশটা তুলে কোথাও পুঁতে ফেলেছে।

চণ্ডীবাবু বলে উঠলেন,—কী সর্বনাশ! উনি ওই গোবেচারা শচীনকেই সন্দেহ করে ফেললেন? শচীনের মতো রোগাটে গড়নের লোক তার কাকার লাশ একা ওঠাতে পারে?

বাসন্তি দেবী বিব্রত মুখে বললেন,—না, মানে আমি ভেবেছিলুম শচীনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুরাও হয়তো ছিল।

চণ্ডীবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। কর্নেল বললেন,—আপনি কি আপনার বড়দাকে একথা বলেছিলেন? কিংবা কোনও ছলে শচীনকেও এরকম কোনও আভাষ দিয়েছিলেন?

বাসন্তি দেবী বললেন,—না, কথাটা আমি কাকেও বলিনি। এমন কথা কি বলা যায়?

কর্নেল বললেন,—তখন আপনার এরকম ধারণা হয়েছিল, এখন আপনার কী ধারণা?

বাসন্তি দেবীর কান্না এসে গেল। আত্মসম্বরণ করে বললেন,—আমার ছোড়দার মতো সন্ন্যাসী সাধাসিধে মানুষকে খুন করার পেছনে আর কী কারণ থাকতে পারে, এবার আপনারাই বলুন। আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই সে দৈবাৎ মুখ ফসকে কোনও দুষ্ট লোককে কথাটা বলে ফেলেছিল। তারপর অভিশাপ লেগে ছোড়দা মুখে রক্ত উঠে মরেছে। তবে আমি কিন্তু আমাদের বাড়ির চারপাশে সব জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও কোনও গর্ত খোঁড়া দেখতে পাইনি। তবে এমনও হতে পারে মোহর ভরতি ঘড়া এর বাইরে কোথাও পোঁতা ছিল।

চণ্ডীবাবু বললেন,—পুলিশ তো এই এলাকা তন্নতন্ন খুঁজেছে, যদি কোথাও মহীনকে পুঁতে রাখা হয় তার খোঁজ মিলবে। কিন্তু তেমন কোনও চিহ্নই তারা পায়নি।

এই সময়েই বারান্দার ওপাশে বাথরুম থেকে এক রুগ্ন চেহারার ভদ্রলোক বেরিয়ে আসতেই বাসন্তি দেবী হন্তদন্ত গিয়ে তাঁকে ধরলেন। বললেন,—সাড়া দিলেই তো আমি যেতুম।

ভদ্রলোকের চেহারায় শচীনবাবুর ছাপ স্পষ্ট। উনি তাহলে শচীনবাবুর বাবা অহীনবাবু। বাসন্তি দেবীর কাঁধে ভর দিয়ে একপা-একপা করে এগিয়ে এসে তিনি ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালেন। বললেন, কারা যেন বসে আছে।

বাসন্তি দেবী বললেন,—চণ্ডীদা এসেছেন। আর তাঁর সঙ্গে কলকাতার সেই কর্নেলসাহেবরা এসেছেন। যাঁদের কাছে শচীন গিয়েছিল।

অহীনবাবু ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলেন। বললেন,—আমার সাধাসিধে সরল ভাইটাকে কারা মেরে ফেলল।

চণ্ডীবাবু উঠে গিয়ে তাঁকে ধরে বললেন,—ঘরে চলুন। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনার কষ্ট হবে।

চণ্ডীবাবু এবং বাসন্তি দেবী অহীনবাবুকে ঘরে তাঁর বিছানায় শুইয়ে রেখে বাইরে এলেন। সেই সময়েই কর্নেল বাসন্তি দেবীকে বললেন,—একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে। শচীনবাবুর একটা পায়ে গন্ডগোল আছে। আমি লক্ষ করেছি, উনি মোটা ছড়ির সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারেন না।

বাসন্তী দেবী বললেন,—ওঁর বাঁ-পায়ের পাতা জন্ম থেকেই একটু বাঁকা।

তাই ছোটবেলা থেকেই খুঁড়িয়ে হাঁটতো শচীন। স্কুল যেত একটা মোটাসোটা বেতের ছড়িতে ভর দিয়ে। ছাত্ররা ওকে খোঁড়ামাস্টার বলে আড়ালে ভেংচি কাটত।

চণ্ডীবাবু তখনই হাসতে-হাসতে বললেন,—বেচারা খোঁড়া মাস্টারের ওপর তুমি সন্দেহ করে ভেবেছিলে, সে নাকি তার কাকার লাশ গুম করেছে!

বাসন্তি দেবী জিভ কেটে বললেন,—না-না, মানে ওর দু-একজন বন্ধু আছে, তারা তো ভালো লোক নয়। তুমি তাদের চেনো চণ্ডীদা। কায়েত পাড়ার গোপেন আর ওই যে একচোখা লোকটা—কী যেন নাম। সদগোপ পাড়ায় বাড়ি—

চণ্ডীবাবু বললেন,—ভুতুর কথা বলছ?

বাসন্তি দেবী চাপাস্বরে বললেন,—কিছুদিন আগে থেকে গোপেন আর ভুতু ঘনঘন এ-বাড়িতে আসত। শচীনের সঙ্গে আড্ডা দিত। এখন আর আসে না।

কর্নেল বললেন,—পুলিশকে কি আপনি একথা জানিয়েছেন?

বাসন্তিদেবী করজোড়ে চাপাস্বরে বললেন,—মিনতি করে বলছি বাবা, একথা যেন কেউ জানতে না পারে। ওরা দুজনেই খুব বজ্জাত লোক। পুলিশের খাতায় ওদের নাম আছে—তাই না চণ্ডীদা?

চণ্ডীবাবু বললেন,—ওরকম অনেকের নামই পুলিশের খাতায় আছে। যাই হোক, তুমি আর যেন কারুকে মুখ ফসকে এসব কথা বলে ফেলো না।

চাটুজ্যেবাড়ি থেকে রাস্তার দিকের সদর দরজা দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলুম। তারপর কর্নেল বাড়ির পেছনের দিকটা বাইনোকুলারে দেখে নিয়ে বললেন,—রাতবিরেতে ভূতেরা অনায়াসে শচীনবাবুদের বাড়ির ছাদে উঠে দাপাদাপি করতে পারে। ঢিলও ছুঁড়তে পারে।

এরপর আমরা রাস্তার উত্তরদিকে এগিয়ে বাঁ-দিকের সেই পুকুরপাড়ে গেলাম। তার নীচেই চণ্ডীবাবুর গাড়ি আছে। কতকগুলো বাচ্চা ছেলে আমাদের দেখামাত্র ডানদিকে আমবাগানের ভেতর পালিয়ে গেল। বোঝা গেল তারা মোটর গাড়িটা নিয়ে ইচ্ছে মতো খেলা করছিল। চণ্ডীবাবু গাড়ির লক খুলছেন, এমন সময় কর্নেল বললেন,—একটু অপেক্ষা করুন। আমি পুকুরের পূর্বদিকটা দেখে আসি।

আমি কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। পুকুরপাড়ের নীচে একটা পোড়ো

জমি। তার একদিকে বাঁশবন। কর্নেল পোড়ো জমি দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন,—এদিকটায় বসতি নেই দেখছি!

কোথাও-কোথাও ফসলের খেত, কোথাও আখচাষ করা হয়েছে। হঠাৎ দেখলুম কর্নেল আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচিলের নীচে থেকে দুটো নুড়ি-পাথর কুড়িয়ে নিলেন। বললুম,—কী আশ্চর্য! ভূতের ঢিলগুলো বাড়ির ভেতরে পড়ার কথা। পড়েওছিল। এখানে এই নুড়িগুলো কে রাখল?

কর্নেল তাঁর পিঠে-আঁটা কিটব্যাগের চেন টেনে তার ফাঁক দিয়ে নুড়ি-পাথর তিনটে ভেতরে ঢোকালেন। তারপর চেন টেনে কিটব্যাগের মুখ বন্ধ করলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে বাঁশবনের ভেতরটা একবার দেখে নেওয়ার পর বললেন,—চলো, ফেরা যাক।

তাঁকে অনুসরণ করে বললুম,—ওখানে নুড়ি-পাথর পড়ে থাকাটা খুব রহস্যজনক মনে হচ্ছে।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, রহস্য তো এখন আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

বললুম,—বাসন্তিদেবীকে বলা উচিত ছিল হাড়িকাঠের রক্তটা মানুষের নয়।

কর্নেল মুখ ঘুরিয়ে চোখ কটমট করে বললেন,—মুখটি বুজে থাকবে।

গাড়ির কাছে গেলে চণ্ডীবাবু বললেন,—আপনাকে খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। অমন করে পাঁচিলের ধারে হুমড়ি খেয়ে কী দেখছিলেন। রক্ত? ওখানেই এক পাটি স্যান্ডেল পাওয়া গেছে।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—আমি দ্বিতীয় পাটি স্যান্ডেলটা খুঁজে দেখছিলুম।

চণ্ডীবাবু গাড়িতে উঠে বললেন,—আর-এক পাটি জুতো নিশ্চয়ই গঙ্গাগর্ভে ছুঁড়ে ফেলেছে ওরা।

কর্নেল আগের মতো গাড়ির সামনের সিটে বাঁদিকে বসলেন। আমি বসলুম পেছনে। চণ্ডীবাবু স্টার্ট দিয়ে গাড়ির মুখ সবে ঘুরিয়েছেন, এমন সময় আমবাগানের ভেতর থেকে ছুটে আসতে দেখলুম হালদারমশাইকে। তিনি যে এত জোরে ছুটতে পারেন তা দেখার সৌভাগ্য কোনওদিন আমার হয়নি। কর্নেলের কথায় তক্ষণে চণ্ডীবাবু গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন। হালদারমশাইয়ের সোয়েটারে এবং প্যান্টের এখানে-ওখানে কাদার ছোপ। উনি হাঁফাতে-হাঁফাতে

বললেন,—আমি কর্নেলসাহেবেরে দেইখ্যাই ছুট দিসিলাম। ওঃ, কী কাণ্ড!

আমি দরজা খুলে দিলে তিনি ভেতরে ব্যাক সিটে বসলেন। তারপর পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে এক টিপ নস্যি নিলেন।

সামনে থেকে কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—আপনি কি কারুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করছিলেন হালদারমশাই। আপনার পোশাকে অত কাদার ছোপ কেন?

গোয়েন্দাপ্রবর নোংরা রুমালে নাক মুছে বললেন,—না কর্নেলস্যার, একজনেরে ফলো কইর‍্যা যাইতেছিলাম। আমবাগানের শেষ দিকটার খানিকটা জায়গা ঝোপজঙ্গলে ঢাকা। তার ওধারে একটা বসতি।

চণ্ডীবাবু বললেন,—ওটা জেলে পাড়া।

হালদারমশাই বললেন,—যারে ফলো করসিলাম, সে একখানে খাড়াইয়া যেন কারো লাইগ্যা ওয়েট করত্যাসিল। তারপর একজন আইয়া তারে কইল—খবর কও। তারপর দুইজনে চাপাস্বরে কী কথা হইল আমি শুনি নাই। তাই সাপের মতন উপুড় হইয়া আউগাইয়া যাইতেসিলাম। তখনই পোশাকে কাদা লাগসে। মাটিটা নরম।

কর্নেল বললেন,—তারপর কিছু শুনতে পেলেন?

হালদারমশাই বললেন,—নাঃ! ওরা দুইজনে সেখান থিক্যা উধাও হইয়া গেল।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—আপনি কাকে ফলো করেছিলেন?

হালদারমশাই বললেন,—তারে চিনি না, কিন্তু আমি বাঁশঝাড়ের ভেতর যখন আর-এক পাটি জুতা খুঁজত্যাছিলাম, তখনই লোকটারে চোখে পড়সিল। সে শচীনবাবুগো বাড়ির পাঁচিলের বাহির দিয়া আইত্যাসিল। তারপর একখানে খাড়াইয়া ছিল। আমারে সে কীভাবে ট্যার পাইল কে জানে। সে আমবাগানের ভেতর দিয়া উধাও হইয়া গেল। কাজেই তারে ফলো না কইর‍্যা উপায় ছিল না।

চণ্ডীবাবু জিগ্যেস করলেন,—লোকটার চেহারা কেমন? পরনে কী পোশাক ছিল?

হালদারমশাই বললেন,—লোকটার চেহারা এক্কেরে ভূতের মতন কালো।

আমি না বলে পারলুম না,—ভূতের গায়ের রং কালো, তা কি আপনার পুলিশ লাইফে দেখেছেন?

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন,—না ওটা কথার কথা। লোকটার মুখের

চেহারা এমনিতেই কুৎসিত। অর একখানা চক্ষু নাই। পরনে যেমন-তেমন একটা ফুলপ্যান্ট, আর সোয়েটার। মাথায় মাফলার জড়ানো ছিল।

চণ্ডীবাবু বলে উঠলেন,—তাহলে বাসন্তির কথাই ঠিক। ওই লোকটা সেই একচোখে বজ্জাত ভুতু।

গোয়েন্দাপ্রবর হাসতে-হাসতে বললেন,—এক্কেরে মানানসই। ভূতের নাম ভুতু হইলে সে মানুষ-ভুত। হ্যাঁ, যে লোকটা তারে দেখা করতে আইসিল, তার চেহারা ভদ্রলোকের মতন। কিন্তু তার গোঁফখান দেইখ্যা মনে হইসিল, লোকটা দাগি আসামি। ওই যে কথায় আসে না, শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়! ওইরকম গোঁফ ভদ্রলোক রাখে না।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে, আপনি পুলিশের সামনে যেন মুখ ফসকে এসব কথা বলবেন না।

চণ্ডীবাবু বললেন,—আমার খুব অবাক লাগছে। বাসন্তি তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছিল। দ্বিতীয় লোকটার নাম গোপেন। ওর বাবাকে লোকে বলত পোড়াসিংঘি। কারণ, ওর বাবা গোপাল সিংহের মুখের একটা পাশ ছোটবেলায় পুড়ে গিয়েছিল। কেউ-কেউ অবশ্য পোড়া কায়েতও বলত। তার ছেলে গোপেন যে গুণ্ডামি করে বেড়াবে, এমনকি ডাকাত দলেও নাম লেখাবে, এটা কেউ কল্পনা করতেও পারেনি।

কর্নেল বললেন,—আপনারা শচীনবাবুকে এসব কথা যেন বলবেন না। দরকার হলে আমি শচীনবাবুর সঙ্গে কথা বলে ওই লোকদুটোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বতার কারণটা খুঁজে বের করব।

চণ্ডীবাবুর বাড়ি পৌঁছুনোর পর হালদারমশাই সোয়েটার এবং প্যান্টের কাদা পরিষ্কার করতে বাথরুমে ঢুকলেন। চণ্ডীবাবু দোতলায় নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। শুধু কার্তিক আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। সে বলল,— সায়েবরা এবার নিশ্চয়ই কফি খাবেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, এক কাপ কফি পেলে ভালো হয়।

কার্তিক চলে যাওয়ার পর কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—জয়ন্ত, এখন তোমার কী মনে হচ্ছে, আমাকে খুলে বলো।

একটু ভেবে নিয়ে বললুম,—আমার মনে হচ্ছে, মহীনবাবুকে কোথাও ওই ভুতু আর গোপেন মিলে জোর করে আটকে রেখেছে। তার ওপর অত্যাচার করে পূর্বপুরুষের লুকিয়ে রাখা সোনার মোহর ভর্তি ঘড়া কোথায় আছে, তা

জানার জন্যে ওরা চেষ্টা করছে। আর শচীনবাবু সম্ভবত সেই সোনার মোহরের লোভে ওদের ফাঁদে পা দিয়েছে।

কর্নেল বললেন,—তাহলে শচীনবাবু চণ্ডীবাবুর কাছে পরামর্শ চাইতে গিয়েছিলেন কেন? আর যদি বা গেলেন, তিনি চণ্ডীবাবুর মুখে আমার পরিচয় পেয়েই গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর মতো একজন খোঁড়া মানুষ এতটা ঝুঁকি নেবেনই বা কেন?

এই সময়েই চণ্ডীবাবু ঘরে ঢুকে বললেন,—কফি আসছে। আর যার জন্য কর্নেল সাহেব মনে-মনে অপেক্ষা করছিলেন, সেই শচীনও তার গাবদা মোটা ছড়িটা নিয়ে গেটে ঢুকছে দেখলুম।

কর্নেল বললেন,—বাঃ, সুখবর। তবে আপনি কফি খেয়েই কাজের অছিলায় এ-ঘর থেকে যেন কেটে পড়বেন।

॥ ছয় ॥

শচীনবাবুকে কার্তিক আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে শচীনবাবু নমস্কার করে বললেন,—পিসিমার মুখে শুনলুম আপনারা আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। আমি একটুখানি বাজারের দিকে গিয়েছিলুম। পিসিমার মুখে শুনেই সাইকেলরিকশাতে চেপে চণ্ডীবাবুর বাড়িতে এলুম। দারোয়ান বললে, হ্যাঁ, কর্নেলসাহেবরা কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছেন।

চণ্ডীবাবু বললেন,—বসো শচীন। তোমার জন্যে এক কাপ কফি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শচীনবাবু বললেন,—না কাকাবাবু, এইমাত্র আমি বাজারে চা খেয়ে-খেয়ে মুখ তেতো করে ফেলেছি। আর কিছু খাব না।

চণ্ডীবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ঠিক আছে। তাহলে তোমরা কথাবার্তা বলো। আমার একটা জরুরি কাজ আছে। কাজটা সেরে নিয়ে আবার আসব।

তিনি চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন,—আপনাদের বাড়িতে যে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দিন-দুপুরে পাঁচিলের ওপর দিয়ে কালো কুচ্ছিত একটা বিদঘুটে মুখ উঁকি দিচ্ছিল। আমি তাড়া করে যেতেই অদৃশ্য হল।

শচীনবাবু গম্ভীর মুখে বললেন,—কথাটা পিসিমার কাছে শুনে এলুম। আমার মনে হচ্ছে কলকাতা থেকে আপনার মতো খ্যাতিমান রহস্যভেদী সদলবলে এখানে এসে পড়েছেন, তাই ছোটকাকার খুনিরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

হালদারমশাই তাঁর সোয়েটার আর প্যান্টের কাদাগুলো জল দিয়ে আলতোভাবে সাফ করে কফির আসরে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন,—আপনাগো বাড়ির লগে একখান বাঁশঝাড় আছে।

শচীনবাবু চমকে উঠে বললেন,—হ্যাঁ আছে। কিন্তু আপনি কি সেখানে সন্দেহজনক কিছু দেখেছেন?

হালদারমশাই কী বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল তাঁকে থামিয়ে বললেন,—ওসব কিছু না। আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

শচীনবাবু বললেন,—নিশ্চয়ই দেব। আমি যা যতটুকু জানি সব বলব।

কর্নেল বললেন,—গোপেন আর ভুতু নামে দুটো লোক আপনার কাছে নাকি আড্ডা দিতে আসত।

শচীনবাবু চমকে উঠে বললেন,—পিসিমা বলেছেন? আসলে কী হয়েছে জানেন, ওরা দুজনেই এলাকার নামকরা বজ্জাত। শুধু বজ্জাত বললে ভুল হবে, ওরা না-পারে এমন কাজ নেই। কিন্তু আমার স্কুললাইফে ওরা দুজনেই আমার সহপাঠী ছিল। সেই সূত্রে রাস্তাঘাটে দেখা হলে কথাবার্তা বলেছি। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন থেকে ওরা একরকম জোর করেই আমার ঘরে ঢুকে আড্ডা দিত। বাধ্য হয়ে পিসিমাকে বলে ওদের চা খাওয়াতে হতো। তারপর ক্রমে-ক্রমে বুঝতে পারলুম, আমার কাছে ওদের আসার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার ধারণা হয়েছিল সম্ভবত সরল সাদাসিধে সন্ন্যাসীটাইপ মানুষ আমার কাকা হয়তো কথায়-কথায় ওদের কাছে জানিয়ে দিয়েছেন, আমাদের পূর্বপুরুষের একঘড়া সোনার মোহর কোথায় পোঁতা আছে, তার খবর তাঁর জানা।

কর্নেলসাহেব, এই কথাটা আমার আপনার কাছে যাওয়ার আগেই মাথায় এসেছিল, কারণ হঠাৎ করে পাগলা বিনোদের মড়া দেখা নিয়ে গুজব আর রাতবিরেতে আমাদের বাড়িতে ভুতুড়ে উৎপাত কেন হচ্ছে। আপনার কাছ থেকে ফিরে এসে যখন আমাদের মন্দিরের হাড়িকাঠের কাছে রক্ত দেখতে পেলুম, তখনই বুঝলুম আমার কাকা হয়তো মোহর ভরতি ঘড়াটা কোথায় আছে তা দেখিয়ে দেয়নি বলেই তাকে ভুতু আর গোপেন মিলে খুন করেছে। তারপর বডিটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আমি ভুতু আর গোপেনের নাম সাহস

করে পুলিশকে বলতে পারিনি। পিসিমাও ওদের ভালো চেনে, তাই পিসিমাও মুখ বুজে থেকেছে।

হালদারমশাই বললেন,—ওদের মধ্যে একজনের কি একটা চক্ষু নাই?

শচীনবাবু আবার চমকে উঠে বললেন,—ভুতুর একটা চোখ জন্ম থেকেই নেই। কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন?

আমি বললুম,—আপনি ভুলে গেছেন, উনি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কাজেই উনি এখানে এসেই এখানে-ওখানে ওত পেতে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

কর্নেল বলে উঠলেন,—ভুতু আর গোপেনের না কি ডাকাতের দল আছে?

শচীনবাবু চাপাস্বরে বললেন,—ছিল। থানায় নতুন ওসি আসার পর থেকে এ-এলাকা ছেড়ে ওদের দলের লোকেরা শুনেছি পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভুতু আর গোপেনের একজন শক্ত গার্জেন আছে। তাই তারা এখনও বেপেরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্য ওরা তেমন সাংঘাতিক কাজ করে ফেললে নতুন ওসি ওদের রেহাই দেবেন বলে মনে হয় না।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—সেই প্রভাবশালী গার্জেন কী করেন? তাঁর নাম কী?

শচীনবাবু আবার চাপাস্বরে বললেন,—এসব কথা কানে গেলে লোকটা উলটে আমাকেই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে।

কর্নেল একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,—আহা, আমি জানতে চাইছি, সে কে? কী করে?

শচীনবাবু এবার ফিসফিস করে বললেন,—তাঁর নাম মনীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। তিনি এই চণ্ডীবাবুদেরই জ্ঞাতি। কিন্তু চণ্ডীবাবুর ঘোর শত্রু। উনি এখানকার একটা রাজনৈতিক দলের নেতা।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে। এবার বলুন আপনাদের দূর-সম্পর্কের জ্ঞাতি, অ্যাডভোকেট শরদিন্দু চ্যাটার্জির কাছে আপনাদের পূর্বপুরুষের যে দলিলটা আছে, তা কি আপনি কখনও দেখেছেন?

শচীনবাবু বললেন,—আমি দেখিনি। বাবাকে একবার শরদিন্দু জেঠু ওটা দেখিয়েছিলেন। বাবা কিছু বুঝতে পারেননি। কিন্তু চণ্ডীকাকুর সঙ্গে আমার অ্যাডভোকেট জেঠুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে। ছুটি পেলে শরদিন্দু জেঠু এখানে চলে আসেন। চণ্ডীকাকুর বাড়িতেই ওঠেন। উনি একসময়কার নামকরা শিকারি।

এখনও বিলে বুনো হাঁস মারতে আসেন।

কর্নেল এবার পকেট থেকে সেই প্রাচীন তুলোট কাগজে নাগরি লিপিতে লেখা দলিলের কপিটা শচীনবাবুর হাতে দিয়ে বললেন,—এটা আপনার পূর্বপুরুষের সেই দলিলের কপি।

শচীনবাবু কাগজটা কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন,—এটা তো কোনও দলিল নয়, কী সব অং বং হুং লেখা আছে। কয়েকটা তীর আঁকা আছে।

কর্নেল বললেন,—এটা দেখে আপনার মাথায় কিছু আসছে না?

শচীনবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন,—না। বাবাও বলেছিলেন কিছুই মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না।

কর্নেল তাঁর হাত থেকে কাগজটা ফিরিয়ে নিয়ে পকেটে ভাঁজ করে রাখলেন। তারপর বললেন,—ভুতু এবং গোপেনকে আপনি এই কাগজে যা লেখা আছে তার একটা কপি পৌঁছে দিতে পারবেন? না, শুধু পৌঁছে দিলে হবে না, তাদের বলতে হবে, যে-গুপ্তধনের লোভে আপনার কাকুকে খুন করেছে তারা, এই কাগজটা সেই কাকার কাছ থেকেই পাওয়া। এতেই গুপ্তধনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

শচীনবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন,—এটা যদি সত্যি আমাদের পূর্বপুরুষের লেখা হয়, তাহলে এটা কি ওদের হাতে দেওয়া ঠিক হবে?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হবে। ওদের যা বিদ্যে, তাতে ওরা এটা থেকে কোনও সূত্রই বের করতে পারবে না। কিন্তু ওরা যদি সত্যি গুপ্তধন হাতানোর উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে ভাব জমায়, আর রাত-বিরেতে ভূতুড়ে উৎপাত করে থাকে তাহলে ওরা টোপ গিলবে। অর্থাৎ এটার অর্থ উদ্ধারে কারও সাহায্য নেবে।

শচীনবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—না কর্নেলসাহেব, এটা ওদের হাতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওরা এটার অর্থ উদ্ধারের জন্যে আমার বা আমার রুগ্ন বাবার ওপর জুলুম চালাবে। সারাবছর তো পুলিশ আমাদের রক্ষা করবে না।

কর্নেল বললেন,—তাহলে আমাদের যে-কোনও উপায়ে হোক এই টোপটা ওদের গেলাতে হবে। শচীনবাবু, আপনি বুঝতে পারছেন না, এটা একটা ফাঁদ। ঠিক আছে, আপনি এ-বেলা ভেবে দেখার সময় নিন, তারপর বিকেলের

দিকে কিংবা রাত্রে আমাদের জানিয়ে দেবেন। কিন্তু একটা কথা, এ-নিয়ে আপনার পিসিমা বা বাবার সঙ্গে কক্ষনো আলোচনা করবেন না।

শচীনবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন,—আচ্ছা কর্নেলসাহেব, আমাদের বাড়িতে রাতবিরেতে যে পাথরের নুড়িগুলো ছোঁড়া হয়, সেগুলো তো পাহাড়ি মুলুকের নদীতে পাওয়া যায়। ভুতু বা গোপেন কখনও অতদূরে কোথাও গেছে বলে মনে হয় না। তাহলে ওরা ওগুলো পেল কোথায়?

কর্নেল বললেন,—আপনার কাকার ঘর তো পুলিশ সার্চ করেছে। তাঁর ঘরে কি কোনও সন্দেহজনক জিনিস, কিংবা ধরুন ওরকম নুড়ি-পাথর পাওয়া গেছে?

শচীনবাবু আবার চাপাস্বরে বললেন,—পিসিমা একদিন কাকার ঘর পরিষ্কার করতে ঢুকেছিল। কাকা তাঁর ঘরে কাউকে ঢুকতে দিতেন না। ওঁর ঘরে সব নানারকম শাস্ত্রীয় বই আর একটা মড়ার খুলি—এইসব নানারকমের অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস থাকে। তা একদিন পিসিমা কাকার ঘরে ঢোকার সুযোগ পেয়েছিল। কাকা দরজায় তালা না দিয়ে বাথরুমে ঢুকেছিলেন। পিসিমা ভেতরে উঁকি মেরে বিছানার পাশে তিনটে ওইরকম ডিমালো নুড়ি দেখতে পেয়েছিলেন। উনি ভেবেছিলেন, ভূতের ঢিলগুলো কুড়িয়ে কাকাই বোধহয় ওখানে রেখেছেন। তাই উনি ঢিল তিনটে কুড়িয়ে নিয়ে রান্নাঘরের পাশের পাঁচিল গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, কর্নেল সেই তিনটে ঢিল আজ কুড়িয়ে পেয়েছেন। কিন্তু কর্নেল যেন কোনও মন্ত্রবলে সেটা টের পেয়েই একবার আমার দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে নিয়ে তারপর বললেন,—হ্যাঁ আপনার পিসিমার পক্ষে ভূতুড়ে ঢিল দেখে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তারপর কি আপনার কাকা এ-ব্যাপারে কোনও হইচই বাঁধিয়েছিলেন?

শচীনবাবু বললেন,—না, আপনাকে তো আগেই বলেছি, কাকা সন্ন্যাসীটাইপ মানুষ। খামখেয়ালি। আমরাই বলতুম, কাকার মাথায় ছিট আছে। তা ছাড়া একটু মনভোলা স্বভাবের মানুষও ছিলেন।

কর্নেল বললেন,—এবার একটা কথা। আপনার কাকা কি কখনও তীর্থ করতে গেছেন?

শচীনবাবু বললেন,—হ্যাঁ। কাকা বছরে অন্তত বার দুই-তিনেক তীর্থ করতে যেতেন। প্রতিবারই আমাদের ভয় হত, উনি হয়তো আর বাড়ি ফিরবেন

না। কোনও সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে হিমালয়ে গিয়ে বাস করবেন। কিন্তু কাকা ফিরে আসতেন, তারপর তীর্থের গল্প শোনাতেন।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—ঠিক আছে। আপনি বাড়ি ফিরে গিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখুন। আমার কথা মতো ওই কাগজের একটা কপি ভুতু আর গোপেনকে দেবেন কি না। এটা কিন্তু খুব জরুরি।

শচীনবাবু উদ্বিগ্ন মুখে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে সেই মোটা লাঠির মতো ছড়িটা ছিল। সেটাতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতেই বেরিয়ে গেলেন।

হালদারমশাই উঠে গিয়ে দরজায় উঁকি মেরে শচীনবাবুর প্রস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ফিরে এলেন। তারপর উত্তেজিতভাবে বললেন,—আমি এবার শচীনবাবুরে সুযোগ পাইলেই ফলো করুম। ভদ্রলোকেরে আমার আর সরল মানুষ ঠেকত্যাসে না।

জিগ্যেস করলুম,—কেন বলুন তো?

হালদারমশাই বললেন,—সেই একচক্ষু ভুতু আর তার লগে গোপেনেরে আমি কথা কইতে দেখসি। একচক্ষু বজ্জাতটা শচীনবাবুগো বাড়ির পাশ দিয়া বাহির হইয়া হনহন কইর‍্যা আমবাগানের ভেতর দিয়া যাইত্যাসিল। এখন মনে হইত্যাসে বাড়ির পেছন দিকে কোথাও ওই একচক্ষু লোকটা শচীনবাবুর লগে গোপনে পরামর্শ করত্যাসিল। অগো তিনজনের মইধ্যে যোগাযোগ আছে। অরা তিনজনে একখান ত্রিভুজ।

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—আপনার এই ত্রিভুজতত্ত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমি বললুম,—এযাবৎকালে গুপ্তধন নিয়ে কয়েক ডজন রহস্যের সমাধান কর্নেল করেছেন। গুপ্তধন কোথাও পাওয়া যায়নি, তা ঠিক। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে সত্যি-সত্যি চাটুজ্যে বাড়ির কোথাও-না-কোথাও সোনার মোহর ভরতি একটা ঘড়া পোঁতা আছে। ওই কাগজটার মধ্যেই তার সংকেত আছে।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—তোমাকে একটা কপি দেব, তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো গুপ্তধনের জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারো কি না।

চণ্ডীবাবু এতক্ষণে ঘরে ঢুকলেন। হাসতে-হাসতে বললেন,—শচীনের মুখ-চোখ দেখে মনে হল ওকে আপনি ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। আমাকে খুলে কিছু

বলল না, শুধু গোমড়া মুখে একটা কথা বলল, ওবেলা সে সন্ধ্যার দিকে কর্নেলসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

কর্নেল বললেন,—আচ্ছা মিস্টার রায়চৌধুরী, শচীনের মুখে শুনলুম, আপনাদের এক জ্ঞাতি মণীন্দ্র রায়চৌধুরী—

চণ্ডীবাবু কর্নেলের কথার ওপর বললেন,—শচীন কি মণি সম্পর্কে কিছু বলছিল?

কর্নেল বললেন,—তিনি নাকি একটা রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতা। আপনাদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। একচোখা ভুতু আর গোপেন নাকি তাঁর চ্যালা।

চণ্ডীবাবু বিকৃতমুখে বললেন,—মণি রায়চৌধুরি বংশের কলঙ্ক। আমার ঠাকুরদার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৌত্র সে। কাজেই রক্তের সম্পর্ক আছে তা বলা যায়ই। কিন্তু তার রাজনৈতিক দল তার কাজকর্মে খুব অসন্তুষ্ট। তা ছাড়া খুলেই বলি, আমি রাজনীতি করি না, কিন্তু মণি এক-একসময় এমন সব সাংঘাতিক কাজ করে যে তার মা গোপনে এসে আমার সাহায্য চায়। আমার মা বেঁচে নেই, কিন্তু মণির মাকে আমি নিজের মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করি।

এই সময় কার্তিক দরজায় উঁকি মেরে বলল,—ঠাকুরমশাই বাজার থেকে ফিরে বললেন, ভুতো আর গোপেনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।

॥ সাত ॥

ভুতু আর গোপেনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে শুনেই হালদারমশাই খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন,—আমি ঠিক দেখসিলাম, ওরা দুইজনে কোনও প্ল্যান আঁটতাসে। পুলিশের সোর্স থাকে। তা তো আপনারা জানেন। এই সোর্সই ওগো ধরাইয়া দিসে।

কিন্তু খবরটা শুনে চণ্ডীবাবু তখনই থানায় ফোন করতে গিয়েছিলেন। কর্নেলকে বলেছিলুম,—এবার থানার ওসি ওদের পেটের কথা সব বের করে নেবেন। মাঝখান থেকে আপনি নিজের কৃতিত্ব দেখানোর সুযোগ হারালেন।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বলেছিলেন,—জয়ন্ত, তোমাকে বরাবর বলে আসছি ন্যায়শাস্ত্রের অপভাষ তত্ত্বের কথা। ইংরেজিতে যাকে বলে হোয়াট অ্যাপিয়াস ইজ নট রিয়েল।

কিছুক্ষণ পরে চণ্ডীবাবু ফিরে এসে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন,—মণির এক আজব কীর্তি। সে-ই পুলিশের কাছে তার দুই বিশ্বস্ত চ্যালার নামে অভিযোগ করেছিল, তারা তার প্রিয় অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে চুরি করে না কি বেচে দিয়েছে। চুরি করার সাক্ষীও আছে। তবে ওসি আমাকে বললেন, কর্নেল সাহেবকে খবরটা দেবেন। কুকুর চুরির ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কর্নেলের একটা মোক্ষম ক্লু হয়ে উঠবে।

কর্নেল সহাস্যে বলেছিলেন—কুকুর চুরির কারণটা আপনাদের বোঝা উচিত।

কথাটা শুনেই চণ্ডীবাবু চমকে উঠে বলেছিলেন,—শচীনদের মন্দিরের সামনে হাড়িকাঠের কাছে পড়ে থাকা রক্ত পরীক্ষা করে কলকাতার ফোরেনসিক এক্সপার্টরা রায় দিয়েছেন ওগুলো মানুষের রক্ত নয়।

হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে কথা শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন,—কী কাণ্ড! অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে তাহলে ওই একচক্ষু ভুতু আর গোপেন মন্দিরের সামনে বলি দিয়েছিল। ঠিক কইসি কি না কন কর্নেলসাহেব।

কর্নেল সায় দিয়ে বলেছিলেন,—আপনি ঠিক ধরেছেন হালদারমশাই। রাত্তির বেলা পথের কুকুর ধরা কঠিন কাজ। তার চেয়ে পোষা কুকুর কোলে তুলে নিয়ে এসে ইচ্ছেমতো তাকে ব্যবহার করা যায়। বেচারা জানত না তাকে ওরা বলি দেবে।

আমি বলেছিলুম,—কুকুর বলি দিয়ে রক্ত ছড়ানোর উদ্দেশ্য কী? কুকুরের বডিটা নিশ্চয়ই গঙ্গার ফেলে দিয়েছে। ফরাক্কার ফিডার ক্যানেলের জলে এখন গঙ্গা বারোমাসই কানায়-কানায় ভরা। স্রোতও তীব্র। কাজেই কুকুরের লাশ এতক্ষণ বহুদূরে পৌঁছে গেছে। কোথাও আটকে গেলে আলাদা কথা।

হালদারমশাই বলছিলেন,—এতক্ষণ লাশের কিস্যু নাই। শকুনের পাল কুত্তাটা বেবাক খাইয়া ফেলসে।

কেন দুই স্যাঙাত মিলে তাদের গার্জেনের পোষা কুকুর ওখানে বলি দিলো, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি কর্নেলের মুখ থেকে আদায় করতে পারিনি।

চণ্ডীবাবু বা হালদারমশাইও কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তবে আমার মনে হয়েছিল শচীনবাবুর ছোটকাকা মহীনবাবুকে নিশ্চয়ই ওরা কোথাও আটকে রেখে গুপ্তধনের খোঁজ পেতে চেয়েছিল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর কর্নেল আমাকে ভাত-ঘুমের সুযোগ দেননি।

ওদিকে হালদারমশাই এবার আরও উত্তেজিত হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন বেলা প্রায় আড়াইটে বাজে। কর্নেল আমাকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। তারপর পকেট থেকে সেই অং বং লেখা কাগজটা বের করলেন। তাঁর প্রকাণ্ড ব্যাগটা থেকে একটা প্যাড বের করে বললেন,—এসো, এই সঙ্কেতগুলোর কোনও সমাধান বের করা যায় কি না দেখি। তোমার মাথায় কিছু এলে আমাকে বলবে। জয়ন্ত এটা কোনও হাসির ব্যাপার নয় কিন্তু।

আসলে আমি তাঁর গাম্ভীর্য দেখে হেসে ফেলেছিলুম। প্যাডটা সেন্টার টেবিলে রেখে হাতে একটা ডট পেন নিলেন। তারপর সেই কাগজটা খুলে পাশে রাখলেন।

কর্নেল বললেন,—ধরা যাক মং-টা মন্দির। কারণ অম্লং থেকে শুরু করলে কিছু বোঝা যাবে না। মং-কে যদি মন্দির ধরি, তাহলে পাঁচ হাত এগোতে হবে মন্দিরের উলটো দিকে। সেটা পেছনের দিক হতে পারে, আবার সামনের দিকও হতে পারে। ধরা যাক মন্দিরটা শচীনবাবুদের শিব মন্দির। মন্দিরের পেছনে কিন্তু পাঁচ হাত জায়গা নেই। অতএব পুকুরের দিকে পাঁচ হাত এগিয়ে যাওয়া যাক। তারপর বাঁ-দিকে দশ হাত এগিয়ে গেলুম—কেমন। তারপর পাঁচ হাত পুকুরের দিকে আবার এগুলুম। এরপর সেখান থেকে ডান দিকে দশ হাত এগুনো যাক। সেখানে আমরা পাচ্ছি অম্লং-কে।

বললুম,—আপনি হং মানে হস্ত ধরছেন?

কর্নেল বললেন,—তীর চিহ্ন দেখে তাই মনে হচ্ছে।

বললুম,—বেশ তো, এবার অম্লং-টা কী?

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকার পর বললেন,—অম্লং বলতেই একটা স্বাদের কথা আসে। অর্থাৎ টক। এখন টক তো কোনও বস্তু হতে পারে না। একটু ভেবে বলো তো জয়ন্ত, পাড়াগাঁয়ে টক বলতে মনে কী ভেসে ওঠে?

বললুম,—টমাটো।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—ধরা যাক দলিলটা পাঁচশো বছরের নয়, ওটা হয়তো বাড়িয়ে বলা হচ্ছে, কিন্তু টমাটো এদেশে এনেছে পর্তুগিজরা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, টমাটো তো স্থায়ী কিছু নয়। চাটুজ্যে বাড়িতে টমাটো চাষ কল্পনা করা যায় না।

আমি বলে উঠলুম,—তাহলে অম্লটা কোনও তেঁতুল গাছ নয় তো?

কর্নেল হেসে উঠলেন,—তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, কিন্তু পাঁচশো কেন দুশো-তিনশো বছরও কোনও তেঁতুলগাছের আয়ু হতে পারে না।

বলে কর্নেল প্যাডের কাগজটা টেনে নিলেন, এবং মূল কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকালেন। প্যাডের কাগজটাও ছিঁড়ে নিলেন। কারণ, ওতে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় কাগজটা এনে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে অ্যাশট্রেতে ঢোকালেন। তারপর তার ওপর নিভে আসা চুরুটটা ঘষটে অ্যাশট্রেতে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,—উঠে পড়ো, বেরুনো যাক।

বললুম,—চণ্ডীবাবুকে সঙ্গে নেবেন না?

কর্নেল বললেন,—না। উনি সম্ভবত তোমার মতো ভাত-ঘুম দিচ্ছেন।

দুজন পোশাক বদলে নিলুম। কর্নেলের নির্দেশে প্যান্টের পকেটে আমার অস্ত্রটা ভরে নিলুম। কর্নেল ওপাশের দরজা খুলে বেল টিপে কার্তিককে ডাকলেন। তখনই কার্তিক এসে হাজির হল। কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—তোমার কর্তামশাই কি ঘুমোচ্ছেন?

কার্তিক বলল,—আজ্ঞে না। উনি আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আপনারা কোথাও যেতে চাইলে আমি যেন ড্রাইভারকে ডেকে দিই।

কর্নেল বললেন,—না, আমরাও তোমার কর্তামশাইয়ের মতো পায়ে হেঁটে বেরুব। তুমি দরজায় তালা লাগিয়ে রাখো।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমে কর্নেল দক্ষিণ দিকে হাঁটতে থাকলেন। সেই সময় সামনের দিক থেকে একটা খালি সাইকেলরিকশা আসছিল। রিকশাওয়ালা নিজে থেকেই থেমে গিয়ে বলল,—সাহেবরা যাবেন নাকি?

কর্নেল ঘড়ি দেখে নিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—শীতের রোদ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। রিকশা করেই যাওয়া যাক।

রিকশায় চেপে তিনি বললেন,—আমরা যাব চাটুজ্যেমশাইদের বাড়ি।

রিকশাওয়ালা মুখ ঘুরিয়ে সন্দিগ্ধভাবে বলল,—যে বাড়িতে মানুষ

খুন হয়েছে—

তার কথার ওপর কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। তবে তোমার ভয় নেই, তুমি খুন হবে না।

রিকশাওয়ালা হাসবার চেষ্টা করে বলল,—আজ্ঞে না স্যার। আমি কারুর সাতে-পাঁচে থাকি না, আমাকে কে খুন করবে?

কর্নেল বললেন,—চাটুজ্যেবাড়ির মহীনবাবুও তো শুনেছি কোনও সাতে-পাঁচে থাকতেন না। সাধু-সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটাতেন। তিনি খুন হলেন কেন?

রিকশাওয়ালা এবার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে বলল,—সাহেবরা কি ওনাদের আত্মীয়?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। শচীনমাস্টার সম্পর্কে আমার ভাইপো হন।

রিকশাওয়ালা এবার বাঁ-দিকে মোড় নিল। দু-ধারেই ইটের বাড়ি। মাঝে-মাঝে মাটির বাড়ি। এটা গলি রাস্তা। লোক চলাচল খুব কম। রিকশাওলা আপন মনে বলল,—এ-সংসারে মানুষ চেনা বড় কঠিন। ভালোমানুষ কি কখনও খুন হয়?

কর্নেল বললেন,—তাহলে কি তুমি বলতে চাও, মহীনবাবু ভালোমানুষ ছিলেন না?

রিকশাওয়ালা অদ্ভুত শব্দে হাসল। বলল,—ভালোমানুষ হলে কি সে-বজ্জাতদের সঙ্গে গাঁজার কলকে টানে?

—কোন বজ্জাতের সঙ্গে উনি গাঁজা খেতেন?

—আপনি চিনবেন না স্যার। দুই বজ্জাতকেই আজ পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। মণি রায়চৌধুরি দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলেন।

কর্নেল হঠাৎ চুপ করে গেলেন। আমার মনে হল উনি রিকশাওয়ালাকে মনের কথা খুলে বলার সুযোগ দিচ্ছেন। একটু পরে বুঝলুম ঠিক তাই। লোকটা আপনমনে কথা বলতে-বলতে প্যাডেলে চাপ দিচ্ছে।

—অমন একখানা তাগড়াই কালো রঙের বিলিতি কুকুর ছিল মণিবাবুর। তাকে চুরি করে কোথায় বেচে দিয়ে এসেছে। মণিবাবু কি সহজে ছাড়বেন? এদিকে থানার বড়বাবুও দুঁদে দারোগা। কত দাগি ওঁর ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে! কানাভুতু আর গুপে সিংঘিকে কাপড়ে-চোপড়ে করে ছাড়বেন।

অলিগলি ঘুরতে-ঘুরতে রিকশাওয়ালা সর্টকাটেই আমাদের চাটুজ্যেবাড়ির সামনে পৌঁছে দিল। কর্নেল তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন। সে বলল,—আমার কাছে খুচরো তো নেই স্যার।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে। তোমাকে পুরো টাকাটাই বকশিশ দিলুম।

সে সেলাম করে চলে গেল। বুঝতে পারলুম বিকেল হয়ে আসছে, আলো কমে গেছে। সম্ভবত পাগলা বিনোদের জ্যান্ত মড়ার ভয়েই লোকটা যেন পালিয়ে গেল।

কর্নেল দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। দেখলুম শচীনবাবু তাঁর গাবদা ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখে যেন অবাক হলেন। বললেন,—আমি এখনই আপনাদের কাছে যাচ্ছিলুম। ভেতরে আসুন স্যার। আমরা ভেতরে ঢুকলে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন,—ভুতু আর গোপেনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে শুনলুম। তবে আমাদের কেসের ব্যাপারে নয়। ওরা নাকি মণি রায়চৌধুরির অ্যালসেশিয়ানটাকে চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে।

কর্নেল বললেন,—আপনার পিসিমা কী করছেন?

—পিসিমা বাবার পা টিপে দিচ্ছেন।

—ঠিক আছে। চলুন আমরা একবার মন্দিরের দিকে যাই।

শচীনবাবু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের দিকের দরজা খুলে দিলেন। একবার পিছু ফিরে দেখলুম বাসন্তি দেবী বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

মন্দিরের সামনে গিয়ে কর্নেল বললেন,—আচ্ছা শচীনবাবু, আপনাদের এই বাড়ির কোথাও কি কোনও বিশাল গাছ ছিল, এমন কথা শুনেছেন?

আমাদের পেছন দিকে খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে বাসন্তি দেবী বলে উঠলেন,—তেঁতুলগাছ? ছোটবেলায় ঠাকমার কাছে শুনতুম, কোন যুগে নাকি কামরূপ কামাক্ষা থেকে এক ডাকিনি একটা তেঁতুলগাছে চড়ে গঙ্গাদর্শনে যাচ্ছিলেন। এ-বাড়ির সীমানায় যেই সে এসেছে, অমনি নাকি সূর্য উঠেছিল। দিনের বেলায় নাকি ডাকিনিদের বাহন গাছ আর উড়তে পারে না। সূর্যের ছটা দেখলেই সেইখানে শিকড় গেঁথে দাঁড়িয়ে যায়।

শচীনবাবু বললেন,—হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। সেই তেঁতুল না কি খাওয়া যেত না। ভাঙলেই রক্ত বেরুত। তবে সেসব নেহাতই বাজে গপ্পো।

ততক্ষণে কর্নেল পিঠের কিট ব্যাগ থেকে একটা গোল ফিতের কৌটো বের করে একদিকটা টেনে আমাকে বললেন,—জয়ন্ত, এই ডগাটা ধরো। মন্দিরের ঠিক মাঝামাঝি বারান্দার গায়ে এটা ধরে থাকো। আঠারো ইঞ্চিতে এক হাত, অতএব পাঁচ বা দশ হাতের হিসেব করতে অসুবিধে নেই।

বলে তিনি পকেট থেকে ভাঁজ করা সেই কাগজটা শচীনবাবুকে দিলেন। শচীনবাবু খুলে দেখে বললেন,—এটা সেই পুরোনো দলিল দেখছি।

এরপর কর্নেলের কাণ্ড দেখে শচীনবাবু আর তাঁর পিসিমা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্নেল তারপর সামনে এক জায়গায় থামলেন। তারপর বাঁ-দিকে এগিয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন,—এবার ফিতেটা তুমি ওই দাগ দেওয়া জায়গায় ধরে রাখো। তারপর তাঁর যে মাপজোক শুরু হল, তা চণ্ডীবাবুর ঘরে বসে কর্নেল একটা প্যাডের পাতায় লিখে ছিঁড়ে ফেলেছেন। তাঁর মাপজোক শেষ হল যেখানে, সেখানে চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচিল। পাঁচিলের নীচে একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে তিনি দাগ দিলেন।

শচীনবাবু বললেন,—কিছুই তো বুঝতে পারছি না কর্নেলসাহেব।

কর্নেল বললেন,—চলুন। বাড়ির ভেতরে এই পাঁচিলের নীচের দিকটা একবার পরীক্ষা করব। জয়ন্ত, তুমি ওই চিহ্নের সোজাসুজি দাঁড়িয়ে পাঁচিলের ওপর একটা হাত তুলে রাখবে। তাহলে আমি বুঝতে পারব পাঁচিলের ভেতর দিকে ওপাশের চিহ্নটা কোথায় পড়বে।

আমি হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলুম। কর্নেল ভেতরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে শচীনবাবু এবং তাঁর পিসিমাও গেলেন। একটু পরে কর্নেল ডাকলেন,—চলে এসো জয়ন্ত। আমার কাজ শেষ।

ভেতরে গিয়ে দেখলুম, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে একটা জবাফুলের ঝোপ। রক্তজবায় ঝোপটা লাল হয়ে আছে।

কর্নেল বললেন,—আশ্চর্য! এখানে দেখছি জবা গাছটার গোড়ায় ঘাসের ভেতরে কয়েকটা নুড়ি-পাথর পড়ে আছে। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য, দেওয়ালের নীচে এই অংশে সিঁদুরের ছোপ।

বাসন্তি দেবী বললেন উঠলেন,—মহীনের কীর্তি। প্রায়ই দেখতুম, ওখানে বসে সে করজোড়ে যেন ধ্যান করছে।

কর্নেল বললেন,—এই নুড়িগুলো যেমন আছে, তেমনি পড়ে থাক। আর আপনাদের একটা কথা বলতে চাই। মহীনবাবুকে কেউ খুন করেনি। তিনি

কোথাও আছেন। হয়তো তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে, অথবা তিনি নিজেই আত্মগোপন করেছেন।

বাসন্তি দেবী এবং শচীনবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

॥ আট ॥

বাসন্তি দেবী এবং শচীনবাবুকে আর কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—চলো জয়ন্ত, আমাদের এখানকার কাজ শেষ। শচীনবাবু, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আশা করি ভূতের উপদ্রব আর হবে না।

রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে কর্নেল চাটুজ্যেবাড়ির উত্তরের পাঁচিলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি আমার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। এই রাস্তাটা সংকীর্ণ এবং ইটের গুঁড়োয় ভরতি। দেখলুম বাঁ-ধারে একটা নতুন বাড়ি উঠছে। সেখানে কেউ নেই। কর্নেল আরও একটু এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড নিমগাছের আড়ালে আমাকে টেনে নিয়ে দাঁড় করালেন। নিমগাছটা চাটুজ্যেবাড়ির দেওয়ালের উত্তর-পূর্ব কোণে। সামনে খানিকটা পোড়ো জমি, তার ওপাশে পুরোনো একটা বাড়ি। সেই বাড়ির দিকে তাকিয়ে কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—একটু লক্ষ রাখো। একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাবে।

কর্নেলের কথা শুনে ভেবেই পেলুম না কখন উনি অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পেলেন। এবং সেই ব্যাপারটা আবার যে ঘটবে, তাই বা কী করে বুঝলেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। আমি কর্নেলের মতো হাঁটু গেড়ে বসে তাকিয়ে রইলুম। তারপর দেখলুম একটা লোক ওই বাড়িটা থেকে কয়েক পা বেরিয়ে এসেই চাটুজ্যেবাড়ির দিকে তাকিয়ে কী দেখল। তারপর আবার সেই বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। দিনের আলো কমে এসেছে, তবু লোকটার চেহারা দেখেই বুঝতে পারলুম সে একজন সাধুবাবা। তার মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা, মুখে একরাশ কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি। গায়ে একটা গেরুয়া হাফ-হাতা ফতুয়া। পরনে খাটো গেরুয়া লুঙ্গি। লোকটার হাবভাব দেখে মনে হল সম্ভবত সে একজন পাগল। তা না-হলে আমরা তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই অন্তত বারতিনেক ওইভাবে বাড়িটা থেকে বেরুল, আবার যেন কিছু দেখে হন্তদন্ত হয়ে সেই বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। তারপর আরও কিছুক্ষণ আমরা বসে রইলুম, কিন্তু সে

আর বেরুল না।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাকে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করলেন। তারপর যেদিক থেকে এসেছিলুম, সেদিকেই দুজনে ফিরে চললুম। চাটুজ্যেবাড়ির সামনের রাস্তায় পৌঁছে এবার ডানদিকে ঘুরে দুজনে এগিয়ে চললুম। এই পথেই রিকশাওয়ালা আমাদের নিয়ে এসেছিল। কিন্তু পাড়াটা একেবারেই নিঝুম এবং রাস্তাঘাটে কোনও লোক নেই। কর্নেল রিকশাওয়ালার মতো শর্টকাট না-করে সোজা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তাটায় কবে পিচ দেওয়া হয়েছিল। এখন এখানে-ওখানে পিচ উঠে গেছে। বললুম,—আমরা এ-পথে গিয়ে কোথায় পৌঁছুব?

কর্নেল বললেন,—যেখানে হোক পৌঁছুব, চিন্তা কোরো না। এবার আমাকে প্রশ্ন করো।

জিগ্যেস করলুম,—ওই সাধুবাবা সম্পর্কে?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ।

বললুম,—আপনি কী করে জানলেন, ওই বাড়িতে এক সাধুবাবা থাকে?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আজ সকালের দিকে চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচিলে যখন ভূতের মুখোশ পরা লোকটার দিকে ছুটে গিয়েছিলুম। তখনই আমার চোখে পড়েছিল পোড়ো জমিটার ওখানে ওই সাধুবাবা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তখন সঙ্গে চণ্ডীবাবু ছিলেন। তাঁর সামনে ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলুম।

অবাক হয়ে বললুম,—সর্বনাশ, আপনি চণ্ডীবাবুকেও সন্দেহ করেন নাকি?

কর্নেল বললেন,—তুমি তো জানো, খেলতে নেমে কখনও আমি নিজের হাতের তাস কাউকেই দেখাই না। এমনকি তোমাকেও না।

এতক্ষণে চোখে পড়ল কিছুটা দূরে রাস্তার একটা বাঁক থেকে একটা গাড়ি এদিকে আসছে। কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে বললেন,—ওই দ্যাখো চণ্ডীবাবুর নাম করতে-করতেই উনি আমাদের খোঁজে ছুটে আসছেন।

গাড়িটা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। চণ্ডীবাবু নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন,—কর্নেলসাহেবের খোঁজে বেরিয়েছিলুম। একমিনিট, আমি গাড়িটা ঘুরিয়ে নিই।

বাঁদিকে একটা গলিরাস্তা ছিল। তিনি সেখান দিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলেন।

তারপর কর্নেল সামনের সিটে এবং আমি ব্যাক সিটে বসলুম। কর্নেল বললেন,—আপনি ছিলেন না, অগত্যা আমি আর জয়ন্ত বেরিয়ে পড়েছিলুম। আমাদের হালদারমশাই কি ফিরেছেন?

চণ্ডীবাবু বললেন,—না। তাঁর জন্য আমি উদ্বেগ বোধ করছি। কানা ভুতু আর গুপে পুলিশের হাজতে। এতে তাদের বন্ধুরা নিশ্চয়ই রাগে ফুঁসছে। দৈবাৎ তাদের পাল্লায় পড়লে মিস্টার হালদার আক্রান্ত হতে পারেন।

কর্নেল বললেন,—আপনি কি ওসি মিস্টার সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন?

চণ্ডীবাবু বললেন,—হ্যাঁ। ওরা বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছে মণির কুকুরটাকে ওরা স্বপ্নে বাবা মহাদেবের আদেশ পেয়ে, তাঁর সামনে বলি দিয়েছে। তারপর ধড় আর মুণ্ডু গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—ওসি কি মণিকে একথা জানিয়েছেন?

চণ্ডীবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—এখনও জানাননি। আমাকেও সতর্ক করে দিয়েছেন। তবে তিনি আপনাকে কথাটা জানাতে বলেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাইনে-বাঁয়ে সংকীর্ণ রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে অবশেষে আমরা চণ্ডীবাবুর বাড়ি পৌঁছুলুম। তখন দিনের রোদ প্রায় মুছে গেছে। ঠান্ডাটা বাড়তে শুরু করেছে।

কার্তিক আমাদের ঘরের তালা খুলে দিয়ে বলল,—আপনারা বসুন স্যার। আমি ঠাকুরমশাইকে কফি করতে বলি। আজ ঠান্ডাটা যেন কালকের চেয়ে বেড়ে গেছে।

চণ্ডীবাবু গাড়ি গ্যারেজে রেখে এতক্ষণে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর সোফায় বসে বললেন,—মিস্টার হালদারের খোঁজে আমি কারুকে পাঠাব নাকি?

কর্নেল বললেন,—থাক। উনি একজন অভিজ্ঞ প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। ওঁর কথা ভাববেন না। আপনাকে এবার একটা কথা জিগ্যেস করি। চাটুজ্যেবাড়ির উত্তরে যে নতুন বাড়িটা হচ্ছে, সেখান থেকে কিছুটা দূরে একটা খুব পুরোনো বাড়ি আছে দেখেছি। ওই বাড়িটা কার?

চণ্ডীবাবু বললেন,—বুঝেছি। ওই বাড়িটার মালিক ছিলেন নলিনী বাঁড়ুজ্যে নামের এক ভদ্রলোক। তিনি দুর্গাপুরে ছেলের কাছে চলে যান। যাওয়ার আগে বাড়িটা দেখাশোনার জন্য হরিপদ হাজরা নামে একটা লোকের ওপর দায়িত্ব

দিয়ে যান। হরিপদর বাড়ি পাশেই। গতবছর মণি রায়চৌধুরী তার দলের অফিস করবে বলে বাড়িটা দখল করেছিল। খবর পেয়ে নলিনীবাবু তাঁর নামে মামলা করেছিলেন। সেই মামলায় তাঁর জয় হয়েছিল। কিন্তু মণি হাইকোর্টে আপিল করেছে। হাইকোর্ট ইনজাংশান দিয়ে বলেছে, যতদিন না মামলার চূড়ান্ত নিস্পত্তি হয়, ততদিন ওই বাড়িতে কেউ বাস করতে পারবে না। আসলে নলিনীবাবুর বাড়িটা তাঁর এক জেঠামশাইয়ের তৈরি। তাঁর কাছেই নলিনীবাবু ছোটবেলা থেকে থাকতেন। সমস্যা হল জেঠামশাই উইল করে তাঁকে বাড়িটা দিয়ে যাননি।

এই সময় ঠাকুরমশাই প্রকাণ্ড ট্রে এনে সেন্টার টেবিলে রাখলেন। দেখলুম কফির সঙ্গে দু-প্লেট পকৌড়া আছে। অতএব শীত-সন্ধ্যায় আরাম করে কফি পান শুরু হল। চণ্ডীবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় কার্তিক এসে খবর দিল, কর্তামশাই আপনার টেলিফোন এসেছে।

চণ্ডীবাবু কফির কাপ-প্লেট হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেলেন।

এই সময়েই কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,—চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচিলের নীচে জবাগাছের গোড়া খুঁড়লে সত্যিই কি সোনার মোহর ভরতি ঘড়া পাওয়া যাবে?

কর্নেল বললেন,—পাওয়া গেলে অনেক আগেই অন্তত শরদিন্দবাবু জায়গাটা খুঁড়ে বের করে ফেলতেন। অবশ্য শচীনবাবুরাও তার ভাগ পেতেন।

বললুম,—আপনি ওই সংকেতের জট যেভাবে খুলেছেন, সেই ভাবেই কি অন্য কেউ খুলতে পারেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—একজন অন্তত পেরেছিল। সে হল মহীন চাটুজ্যে। কারণ, তুমি সচক্ষে দেখেছ পাঁচিলের নীচের দিকটা সিঁদুর মাখানো আর নুড়ি পড়ে আছে।

অবাক হয়ে বললুম,—কিন্তু মহীনবাবুর হঠাৎ অন্তর্ধান একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত তুমি বোঝো সবই, তবে বড্ড দেরিতে। তুমি এখনও বুঝতে পারছ না, ওই প্পাহাড়ি নদীর নুড়িগুলো কে নিয়ে এসেছিল, এবং কে তা রাতবিরেতে বাড়িতে ছুঁড়ে বাড়ির লোকেদের ভয় দেখিয়েছে। এমনকি ছাদে উঠেও দাপাদাপি করেছে।

এবার চমকে উঠে বললুম,—কী কাণ্ড! তাহলে কি মহীনবাবুই তার বাড়ির লোকেদের ভূতের ভয় দেখাতেন?

কর্নেল বললেন,—আবার কে? তবে এ-ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করত

কানা ভুতু আর গুপে সিংঘি। তারা শচীনবাবুর কাছে আড্ডা দিতে এসে আসলে মহীনবাবুর সঙ্গেই যোগাযোগ রাখত। অবশ্য এটা আমার অঙ্ক।

—হঠাৎ আমার চমক জাগল। বললুম,—কর্নেল সেই পুরোনো বাড়িতে যে সাধুবাবাকে দেখলুম, তিনিই মহীনবাবু নন তো?

কর্নেল বলেন,—কিছুক্ষণ পরে আবার আমাদের বেরুতে হবে। মনে-মনে তৈরি থাকো। যাওয়ার সময় থানার ওসি মিস্টার সেন এবং পুলিশ ফোর্স আমাদের সঙ্গে থাকবে।

এই সময় কার্তিক এসে বলল,—কর্তামশাই কর্নেলসাহেবকে ডাকছেন। আপনি এখনই আমার সঙ্গে আসুন।

কর্নেল তখনই দ্রুত উঠে গেলেন। আমি চুপচাপ বসে কর্নেলের অঙ্কটাকে নিজের বুদ্ধিমতো কষে দেখার চেষ্টা করলুম। কিন্তু অঙ্কটা বড্ড জটিল। বিশেষ করে মহীনবাবু কেনই বা তাঁদের পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের খবর ওই বজ্জাত কানা ভুতু আর গুপে সিংঘিকে দিতে চাইবেন। তা ছাড়া তিনি তো সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো মানুষ। সোনার মোহরে তাঁর লোভ থাকার কথা নয়।

অঙ্কটা কষতে গিয়ে হাল ছেড়ে দিলুম। দেখা যাক কর্নেলের রাতের অভিযান কোথায় গিয়ে পৌঁছায়।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ফিরে এলেন। তারপর বললেন,—ওসি প্রণবেশ সেন চণ্ডীবাবুকে ডেকে আমার খবর জিগ্যেস করছিলেন।

বললুম,—তাহলে আপনার প্ল্যান মিস্টার সেনকে জানিয়ে এলেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। আমার অঙ্ক যদি ঠিক হয়, তাহলে সব রহস্য ফাঁস করে দিয়ে রাত দশটার মধ্যেই ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়তে পারব।

জিগ্যেস করলুম,—চণ্ডীবাবু আমাদের সঙ্গী হবেন তো?

কর্নেল বললেন,—হবেন। তবে উনি আমাদের আগেই বেরিয়ে যাবেন। যেখানে আমরা হানা দেব, উনি তার কাছাকাছি জায়গায় উপস্থিত থাকবেন। যাই হোক, এখন ওসব কথা নয়।

বলে কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে ধ্যানস্থ হলেন।

সময় কাটতে চাইছিল না। কিন্তু আটটা বাজতে চলল, তখনও হালদারমশাইয়ের পাত্তা নেই। আমি কর্নেলকে কথাটা বললুম। কিন্তু তিনি কোনও জবাব দিলেন না।

সাড়ে-আটটার সময় কর্নেলের নির্দেশে হালকা জ্যাকেটটা খুলে পুরু

জ্যাকেট পরে নিলুম। তারপর চণ্ডীবাবু এলেন। দেখলুম তিনি ওভারকোট পরেছেন এবং মাথায় টুপি, মুখে পাইপ। বললুম,—মিস্টার রায়চৌধুরীকে যেন শার্লক হোমস বলে মনে হচ্ছে।

তিনি একটু হেসে বললেন,—হোমসসাহেব কি আমার মতো হাতে রাইফেল নিয়ে ঘুরতেন?

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। চণ্ডীবাবু আমাদের থানায় পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। দেখলুম ওসি প্রণবেশ সেন কয়েকজন অফিসারসহ থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কর্নেল এবং আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন,—চলুন বেরোনো যাক।

রাস্তায় বাতিগুলো কুয়াশায় ম্লান হয়ে আছে। নির্জন রাস্তা। আঁকাবাঁকা পথে ঘুরতে-ঘুরতে এক জায়গায় গাড়ি থেমে গেল। মিস্টার সেন চাপাস্বরে বললেন,—আর দু-মিনিট। তারপরই লোডশেডিং হবে।

বুঝলুম বিদ্যুৎ অফিসকে বলে রেখেছেন মিস্টার সেন।

তারপর ঠিকই লোডশেডিং হল। রাস্তার আলোগুলো নিভে গেল। কুয়াশা-নামা অন্ধকারে বুঝতে পারছিলুম না কোথায় এসেছি। একটু পরেই জায়গাটা চিনতে পারলুম। আমরা চাটুজ্যেবাড়ির মন্দিরের কাছে এসেছি। একদল পুলিশ বাড়িটার চারদিক ঘিরে ফেলল।

এরপর আমরা কয়েকজন মন্দিরের চত্বরে গেলুম। ঠিক তখনই কানে এল দেওয়ালের ওপাশে ঘসঘস করে চাপা শব্দ হচ্ছে। তারপর কানে এল বাড়ির সদর দরজার দিকে কেউ কড়া নাড়ছে।

শচীনবাবুর কণ্ঠস্বর কানে এল এবং টর্চের আলো দেখতে পেলুম। এদিকে কর্নেল আমাকে কাঁধে হাত রেখে দরজার পাশে গুড়ি মেরে বসিয়ে দিয়েছেন। অন্যপাশে মিস্টার সেনও বসেছেন। তারপর হঠাৎ এদিকের দরজাটা খুলে গেল। আবছা দেখলুম একটা লোক বেরিয়ে আসছে। অমনি তার মুখে টর্চের আলো ফেলে ওসি মিস্টার সেন বললেন,—শরদিন্দুবাবু, আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল।

তারপর একটা ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ততক্ষণে আরও টর্চের আলো জ্বলে উঠেছে। দেখলুম চণ্ডীবাবুর মতোই ওভারকোট পরা এবং মাথায় হনুমান টুপি পরা তাগড়াই চেহারার-ভদ্রলোকের হাতদুটো পেছন দিকে টেনে একজন অফিসার হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। তিনি চেঁচামেচি শুরু করেদিলেন, কিন্তু তাঁকে ঠেলতে-ঠেলতে পুলিশ অফিসাররা প্রিজন ভ্যানের দিকে নিয়ে গেলেন।

কর্নেলের পেছনে-পেছনে আমি বাড়িতে ঢুকলুম। তারপর দেখলুম বিকেলে-দেখা সেই সাধুবাবাকে পুলিশ হাতকড়া পরিয়েছে। কর্নেল জবা গাছটার দিকে টর্চের আলো ফেললেন। সেখানে একটা শাবল পড়ে আছে। খানিকটা জায়গায় মাটি খোঁড়া।

শচীনবাবু এগিয়ে এসে বললেন,—কী আশ্চর্য! এই সাধুকেই তো একবার সঙ্গে নিয়ে ছোটকাকা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।

আমি অবাক হয়ে কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,—তাহলে আপনি যে বলছিলেন, ওই সাধুবাবাই মহীনবাবু?

কর্নেল বললেন,—আমার অঙ্কে এই জায়গায় একটু গন্ডগোল হয়েছিল। কিন্তু—

বলেই তিনি ওসি মিস্টার সেনকে বললেন,—ওই পুরোনো বাড়িটা পুলিশ ঘিরে রেখেছে তো?

মিস্টার সেন বললেন,—হ্যাঁ। চলুন এবার শিগগির সেখানে যাওয়া যাক।

আমরা পাশের গলি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেই পোড়ো জমিতে পৌঁছুলুম। ভেতরে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ হচ্ছিল। একজন অফিসারের কাঁধের ধাক্কায় এদিকের দরজাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। তারপর ঘরে ঢুকে টর্চের আলোয় দেখলুম হালদারমশাইয়ের সঙ্গে একটা লোকের মল্লযুদ্ধ হচ্ছে।

হালদারমশাই এবার তাকে ছেড়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন,—কর্নেলস্যার এই হইল গিয়া ঘরের শত্রু বিভীষণ।

এতক্ষণে চণ্ডীবাবু উলটো দিক থেকে দৌড়ে এসে বললেন,—এ কী! মণি তুমি এখানে কেন? তোমার চ্যালারা কোথায়? বুঝেছি, তুমি এখানে আড়ি পেতে বসে চ্যালাদের চাটুজ্যেবাড়িতে হানা দিতে পাঠিয়েছিলে।

ওসি প্রণবেশ সেনের নির্দেশে পুরু সোয়েটার আর হনুমান টুপি পরা এক ভদ্রলোককে একজন অফিসার বললেন,—আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি। প্লিজ, রাজনীতির ভয় দেখাবেন না। আমাদের সঙ্গে চলুন।

বলে তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন।

চণ্ডীবাবু বললেন,—উঠোনের কোণে বেচারা মহীন লুকিয়ে বসেছিল। তাকে কনস্টেবলরা ধরেছে। চলুন সেখানে যাওয়া যাক।

ভেতর দিকের উঠোনে নেমে দেখলুম, দেখতে শচীনবাবুর মতো চেহারার এক ভদ্রলোক বোবার চোখে তাকিয়ে আছেন। এত শীতেও তাঁর গায়ে একটা

গেরুয়া ফতুয়া আর পরনে খাটো ধুতি। তিনি চণ্ডীবাবুর দিকে তাকিয়ে কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন,—আমি অতশত কিছু ভাবিনি। শরদিন্দুদা মাঝে-মাঝে আমাকে ডেকে পাঠাতেন, আর বলতেন মণিবাবুর বাড়ি যাবি আর তিনি যা বলবেন, তাই করবি।

কর্নেল বললেন,—তাই আপনি রাতবিরেতে ঢিল ছুঁড়তেন, আর পাগলা বিনোদের মরা সেজে ভয় দেখাতেন।

শচীনবাবুর কাকা মহীনবাবু হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

কর্নেল বললেন,—চলো জয়ন্ত, আসুন হালদারমশাই, আশাকরি আপনাকে ঘুসি খেতে হয়নি?

হালদারমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—না। আমি দরজায় আস্তে কড়া নাড়সি, আর সে টর্চের আলোয় আমারে দেইখ্যা ঝাঁপাইয়া পড়সে।

সে-রাত্রে চণ্ডীবাবুর বাড়িতে ফিরে গিয়ে কফি খেতে-খেতে কর্নেলকে জিগ্যেস করেছিলুম,—সোনার মোহর ভরতি ঘড়াটা উদ্ধার করবেন না?

কর্নেল কিছু বলার আগেই চণ্ডীবাবু বললেন,—ওই কাজটা পুলিশের। সত্যি ওখানে সোনার মোহর ভরা ঘড়া পোঁতা আছে কি না তা পুলিশ খুঁজে দেখবে। আইন অনুসারে সত্যি সেটা পাওয়া গেলে তার মালিক হবে দেশের সরকার। কারণ ওটা পুরাসম্পদ।

এবার শেষ কথাটা বলে ফেলি। আমরা কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পর চণ্ডীবাবু কর্নেলকে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন, দশ-বারো ফিট খুঁড়েও ওখানে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে গর্তের একপাশে কিছুটা জায়গা দেখে পুলিশের মনে হয়েছে, ওখানে সত্যি গোলাকার কিছু পোঁতা ছিল, কোন যুগে কেউ হাতিয়ে নিয়েছে।



কাঞ্চনপুরের প্রেত রহস্য

॥ এক ॥

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে করজোড়ে কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন, গতকাল সকালে আমিই ফোন করেছিলাম। আমার নাম শিবকালী রায়।

কর্নেল হাতের ইশারায় তাঁকে বসতে বললেন। ভদ্রলোক শীর্ণকায়। গায়ের রং কালো। খাড়া নাকের নীচে সরু গোঁফ। তাঁর পরনে ছাইরঙের পাঞ্জাবি এবং ধুতি। আমাকে তিনি তীক্ষ্নদৃষ্টে লক্ষ করছিলেন।

কর্নেল বললেন, আলাপ করিয়ে দিই—জয়ন্ত চৌধুরী, দৈনিক 'সত্যসেবক' পত্রিকার সাংবাদিক। আপনার সব কথা জয়ন্তের সামনেই বলতে পারেন। কারণ সে আমার সহকারী।

শিবকালীবাবু আমাকে নমস্কার করে বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। ব্রজেনবাবু আপনার কথাও বলেছেন।

বলে তিনি কর্নেলের দিকে ঘুরে বসলেন। বললেন, আপনাকে তো বলেছি কর্নেলসাহেব, বেজো মানে আমার পিসতুতো দাদা ব্রজেন পুলিশে চাকরি করত।

এই সময় ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে তিন কাপ কফি নিয়ে এল। কর্নেল বললেন, কফি খান, শিবকালীবাবু। আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে।

তাঁকে কফি খেতে অভ্যস্ত নন বলেই মনে হচ্ছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ কফি খাওয়ার পর তিনি বললেন, এবার কথাটা আরম্ভ করি তাহলে।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। আপনার গুপ্তকথা এবার শোনা যাক।

শিবকালীবাবু কেন কে জানে কর্নেলের কথা শুনে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, গুপ্তকথাই বটে। তবে এখন আর গুপ্তকথা হয়ে নেই। সারা কাঞ্চনপুরে সাড়া পড়ে গেছে।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ, গুপ্তকথা ফাঁস হলে এমনটা হয়। যাই হোক, এবার কথাটা বলুন।

শিবকালীবাবু অর্ধেক খাওয়া কফির পেয়ালা ট্রেতে রেখে প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন. একদিন নয় পরপর তিনদিন একইরকম ঘটনা। রাত একটা বাজলেই প্রথমে আমার দাদা রক্ষাকালীর জানলার কাছে তারপর আমার ঘরের জানলার কাছে ফিসফিস করে কে বলে ওঠে—সুদে-আসলে এক লাখ। বার তিনেক একই স্বরে কথাটা বলার পর কেমন একটা শনশন শব্দ হয়।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনাদের তো একসময় জমিদারি ছিল বলেছিলেন। সেই আমলে আপনাদের বংশের কেউ কারও কাছে টাকা ধার করেননি তো?

শিবকালীবাবু জোরে মাথা নেড়ে বললেন, না। জমিদারি ছিল আমার ঠাকুরদার আমলে। তাঁর আমলেই দেশ থেকে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়। ঠাকুরদার সঙ্গে অনেক উঁচুতলার লোকের ভাব ছিল। তাই জমিদারির ক্ষতিপূরণ শিগগিরই পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আমার বাবা তো ভোটে দাঁড়িয়ে এম এল এ হয়েছিলেন।

—আপনার বাবার নাম কী ছিল?

—কালীপ্রসাদ রায়।

আমি বললুম, তাই বুঝি আপনার আর আপনার দাদার নামে কালী বসেছে।

শিবকালীবাবু আগের মতো হাসবার চেষ্টা করে বললেন, ভালোভাবে বসেনি। তবে আমাদের দু-ভাইয়ের এই নাম নাকি আমার ঠাক্‌মা স্বপ্নাদেশ পেয়ে রেখেছিলেন।

কর্নেল বললেন, আপনাদের গৃহদেবতা তাহলে নিশ্চয়ই মা কালী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা যা বলছিলুম—পরপর তিন রাত্তির এরকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে আর আমরাও যে চুপচাপ বসেছিলুম তা নয়। দ্বিতীয় রাত্রির পর রাত বারোটায় বাড়ির আলো নিভিয়ে ওত পেতে পেছনের দিকে ঝোপের আড়ালে বসেছিলুম। হাতে টর্চ। আর দাদার হাতে তো দোনলা বন্দুক। আমাদের সঙ্গে ছিল বাড়ির পুরোনো কাজের লোক ভোলা।

—তারপর?

—মশার কামড়ে অস্থির হয়ে আমরা একটা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে টর্চ জ্বেলে তন্নতন্ন করে সবখানে খুঁজলুম যদি কোনও বজ্জাত মানুষ ওইভাবে আমাদের ভয় দেখাতে আসে তাহলে সে একটা বাজার একটু আগেই আসবে। তা ছাড়া, তাকে দোতলার জানলার কাছে উঠতে হবে। উঠবে কী করে? জলের পাইপ জানলার কাছাকাছি নেই।

এই বলে শিবকালীবাবু হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর চোখ বড় করে বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার কর্নেলসাহেব, আমরা যে-যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছি তারপর অন্য রাতের মতোই নীচের বসার ঘরে প্রকাণ্ড দেওয়াল

ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল। আর সঙ্গে-সঙ্গে পাশের ঘর থেকে দাদা চিৎকার করে উঠলেন—শিবু, শিবু, সে ব্যাটা এসেছে! তারপরই শুনলুম বন্দুকের গুলির শব্দ। দাদা পরপর দুটো গুলি করার পরই আমি মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে টর্চ হাতে জানলা খুলতে যাচ্ছি, হঠাৎ শুনি সেই ফিসফিসে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর—সুদে-আসলে এক লাখ। তারপরই শনশন শব্দ উঠল। অমনি প্রচণ্ড ভয়ে রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। মনে পড়ল ঠাকমা বলতেন এই বাড়িতে মা কালীর বাস। তাই শিবের চ্যালারা নাকি গোপন খবর মা কালীকে দিতে আসে।

কর্নেল ততক্ষণে চুরুট ধরিয়েছিলেন। বললেন, বাবা মহাদেবের চ্যালারা মা কালীর কাছে খবরাখবর দিতে আসতেই পারে। কিন্তু তাদের কেউ আপনাদের দুই ভায়ের জানলার কাছে ওই সুদের অঙ্কের কথা বলতে আসবে কেন?

শিবকালীবাবু সায় দিয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন, কর্নেলসাহেব। আমারও তাই মত। কিন্তু দাদা বলেন, এই কথাগুলো নাকি রায় পরিবারের গুপ্তকথা। কোন পুরুষে কেউ কারও কাছে কিছু টাকা ধার করেছিলেন, সেই টাকা শোধ দেওয়া হয়নি। এদিকে যে টাকা দিয়েছিল সে মরে গেছে। তার প্রেতাত্মা বাবা মহাদেবের কাছে নালিশ করেছে। তাই কথাটা—

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, বুঝেছি। এবার তৃতীয় রাতের কথা বলুন। বাই দ্য বাই, আপনারা কি ওই ঘটনার পর বাড়ির চারদিকের আলো জ্বেলে রাখেন না? আপনি ফোনে বলেছিলেন কাঞ্চনপুর এখন শহর হয়ে গেছে। কাজেই বিদ্যুৎ থাকার কথা।

শিবকালীবাবু বিরস মুখে বললেন, বিদ্যুতের কথা আর বলবেন না। এই আছে এই নেই। আমাদের বাড়িটা একেবারে শেষ প্রান্তে। কিন্তু আলো প্রায় রাতেই থাকে না। তৃতীয় রাত্রেও আলো জ্বালা ছিল। কিন্তু রাত সাড়ে বারোটায় অন্য রাতের মতো আলো নিভে গিয়েছিল। সেই লোডশেডিং। তারপর নীচের দেওয়াল ঘড়িতে একটা বাজা অবদি আমরা পাহারা দিচ্ছিলুম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কর্নেল, ঘড়ি বাজলই না। আমার হাতের এই ঘড়িতে রেডিয়ম দেওয়া থাকায় দেখে নিলুম একটা দশ বাজে। তাহলে কি আজ আর সেই ব্যাটাচ্ছেলে আসবে না? একসময় মশার কামড়ে অস্থির হয়ে আমরা ঘরে ফিরে এলুম। তারপর শুয়ে পড়লুম। একটু পরেই অদ্ভুত ব্যাপার। নীচের ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল। তারপর আবার সেই উৎপাত। যাই হোক, থানায় গিয়েছিলুম। পুলিশকে সব বলেছি। পরপর কয়েকটা রাত পুলিশ পাহারাও

দিয়েছে। কিন্তু তারপর সেই উৎপাত আর হয়নি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, বাবা মহাদেবের এই চ্যালা তাহলে দেখছি পুলিশকে ভয় পায়। যাই হোক, তারপর?

শিবকালীবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, আজ রবিবার। গত শুক্রবার রাত্রে পুলিশ ছিল না। থানার বড়বাবু তো আমাদের ওপর রেগে কাঁই। আমরা নাকি পুলিশকে মিথ্যে হয়রান করছি। তাঁকে বুঝিয়েসুজিয়ে শান্ত করতে হয়েছে। আর অদ্ভুত কথা গত পরশু শুক্রবার রাত একটায় আবার সেই সুদে-আসলে লাখ টাকার কথা।

কর্নেল বললেন, তাহলে এই গুপ্তকথা কি পুলিশই রটিয়েছে?

—না, কর্নেলসাহেব। পুলিশ আমাদেরই সতর্ক করে দিয়েছিল এসব কথা যেন কেউ টের না পায়। কাজেই পুলিশ রটায়নি। রটিয়েছে আমাদের ভোলা। আসলে ভোলার বুদ্ধিশুদ্ধি কম। ওর কোনও প্রাণের বন্ধুকে নিশ্চয় কথাটা বলেছে। তা না হলে কাল শনিবার আমাদের বাড়িতে দলে-দলে লোকজন এসে ভূতের উৎপাতের কথা জিগ্যেস করবে কেন? এই আরেক উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ির দরজা ভেতর থেকে এঁটে দিয়েছিলুম। আর বাইরের কপাটে একটা বড় কাগজ সেঁটে তাতে ইংরেজিতে লিখেছি—Don't distrub. এটা আমার লেখা। আর দাদা লিখেছেন—Tresspassers will be procecuted!

—বাঃ। কর্নেল সহাস্যে বললেন। ভালো করেছেন।

শিবকালীবাবু এবার উত্তেজিত ভাবে বললেন, রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার ব্রজেন ঘোষ আমাদের আত্মীয়। উনি থাকেন কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে। একসময় উনি আমাদের কাঞ্চনপুর থানায়ও ছিলেন। তাই দাদা আমাকে পরামর্শ দিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ দিয়ে এই রহস্য ফাঁস করতে হবে। ব্রজেনবাবুর কাছে গেলে উনি ভালো প্রাইভেট ডিটেকটিভের খোঁজ দিতে পারবেন।

আমি জানি কর্নেলকে কেউ ডিটেকটিভ বললে উনি খুব খাপ্পা হয়ে যান। বাংলা স্ল্যাং টিকটিকি কথাটা নাকি ডিটেকটিভ থেকে এসেছে। আমি কর্নেলের দিকে তাকিয়েই বুঝলুম শিবকালীবাবু এবার কর্নেলের কাছে হয়তো গলাধাক্কা খাবেন। তাই দ্রুত বললুম, শিবকালীবাবু, কর্নেল ডিটেকটিভ নন। উনি একজন নেচারোলজিস্ট। অর্থাৎ কিনা প্রকৃতি-বিজ্ঞানী।

এবার দেখলুম শিবকালীবাবুর মুখে গাঢ় হতাশার ছাপ। তিনি ভাঙা গলায় বললেন, তবে যে ব্রজেনবাবু বললেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার—

তাঁর কথার ওপরে কর্নেল সহাস্যে বললেন, আপনার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, শিবকালীবাবু। আমার এই কার্ডটা রাখুন। বলে তিনি তাঁর একটা নেমকার্ড শিবকালীবাবুকে দিলেন।

ভদ্রলোক বিড়বিড় করে সেটা পড়তে লাগলেন। সেই সময় ঘড়ি দেখে কর্নেল বললেন, রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার ব্রজেন ঘোষকে আমি স্মরণ করতে পারছি না। তবে দেখলে নিশ্চয় চিনতে পারব। যাই হোক, তাঁর সম্মান রাখতে আমি কাল আপনার ফোন পাওয়ার পরই একটা ব্যবস্থা করে রেখেছি। হ্যাঁ, আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভের কথা বলছিলেন। এক মিনিট, টের পাচ্ছি তিনি আসছেন।

শিবকালীবাবু করুণ মুখে বললেন, কিন্তু ব্রজেনবাবুর কাছে শুনেছি রহস্যের গন্ধ পেলেই সেখানে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়েন।

কর্নেল সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে চকচকে প্রশস্ত টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, হ্যাঁ, রহস্যের গন্ধ পেলে আমি চুপচাপ বসে থাকি না, তবে সেটা বিশেষ একটা সময়ে। আগে ব্রজেনবাবুর কথামতো আপনাকে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ দিচ্ছি। আপনার পুরোনো বন্ধু এই পরিচয় দিয়ে বাড়িতে রাখবেন।

—আর আপনি? আপনি যাবেন না স্যার?

—যাব। আগে প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

কর্নেলের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডোরবেল বাজল। কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন—ষষ্ঠি, তোর টিকটিকিবাবুকে নিয়ে আয়।

আমি অবাক হয়ে দেখলুম কর্নেলের যাদুঘর সদৃশ এই বিশাল ড্রয়িংরুমের দরজা ঠেলে সবেগে প্রবেশ করলেন—আবার কে, স্বনামধন্য প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার, মানে আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই'।

বুঝতে পারলুম কর্নেল শিবকালীবাবুর ফোন পাওয়ার পরই আজ আসতে বলেছিলেন। তিনি সোফার একপাশে ধপাস করে বসে বললেন, বেশি দেরি করি নাই। কী কন কর্নেলস্যার?

কর্নেল সহাস্যে বললেন, হালদারমশাই, আগে আপনার ক্লায়েন্ট অর্থাৎ মক্কেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

গোয়েন্দাপ্রবর গুলি-গুলি চোখে শিবকালীবাবুকে দেখছিলেন। তারপর বললেন, ক্যাসটা কী?

কর্নেল বললেন, আপনার ক্লায়েন্টের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। তারপর তাঁর মুখে সব শুনবেন।

এরপর যথারীতি হালদারমশায়ের জন্য স্পেশাল কফি আনল ষষ্ঠী। কর্নেল তাকে বললেন, ষষ্ঠি, এবার আমাদের গেস্টের জন্য এক কাপ চা। আমার আর জয়ন্তর জন্য কফি।

হালদারমশাই চোখে ঝিলিক তুলে বললেন, জয়ন্তবাবু, এটা ক'রাউন্ড কফি?

বললুম, ফোর্থ রাউন্ড।

কফি পানের পর কর্নেল হালদারমশাইকে কাঞ্চনপুর জমিদারবাড়ির ভূতুড়ে ঘটনা সংক্ষেপে শুনিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে শিবকালীবাবুও কিছু-কিছু বিবরণ জুড়ে দিলেন। এরপর হালদারমশাই শিবকালীবাবুকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জেরা করে বললেন, দেখুন মশায়, আমি চৌত্রিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। রিটায়ার করার পর একখান প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলছি। কাজেই আপনার ক্যাস আমি লইলাম। আর কর্নেলস্যার যখন আমারে আপনাগো হেভি মিস্ট্রি সল্‌ভ করনের দায়িত্ব দিছেন তখন আমি নিজেকে লড়াইয়া দিমু। আপনি চিন্তা করবেন না।

শিবকালীবাবুকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলুম তিনি কর্নেলকেই মনে-মনে চাইছিলেন। আমি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে বললুম, শিবকালীবাবু, কর্নেল সব রহস্যময় ঘটনার সরেজমিন ব্যাকগ্রাউন্ড আগে সংগ্রহ করেন। তাই সবক্ষেত্রেই তিনি আমাদের হালদারমশাইকে আগে পাঠিয়ে দেন।

শিবকালীবাবু বললেন, কিন্তু উনি কি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় কথা বলতে পারেন না?

কর্নেল বললেন, খুবই পারেন। কিন্তু হালদারমশায়ের একটা জেদ আছে।

হালদারমশাই খি-খি করে হেসে বললেন, আমাগো মাতৃভাষা ছাড়ুম ক্যান? মাতৃভাষার লাইগ্যা ঢাকায় আমাগো পোলারা প্রাণ দিছে না? দেশ ছাড়লে কী হইব, রক্তের টান।

শিবকালীবাবু সায় দিয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন। তাহলে আপনি আমার বন্ধু হিসাবে কাঞ্চনপুরে বেড়াতে যাচ্ছেন। আমাদের বাড়িতেই থাকছেন। কেমন তো?

হালদারমশাই বললেন, কর্নেলস্যারের কথায় আমি রেডি হইয়াই আইছি।

বলে তিনি তাঁর ব্যাগটা কাঁধে ঝোলালেন। তারপর শিবকালীবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল চুপচাপ চুরুট টানছিলেন। বললুম, হালদারমশাইকে বাঘের মুখে ঠেলে দেওয়া কি ঠিক হল?

কর্নেল বললেন, বাঘ কথাটা তোমার মাথায় কেন এল, জয়ন্ত?

বললুম, যা বুঝেছি তাতে মনে হচ্ছে এটা টাকাকড়ি দেনাপাওনার ব্যাপার। পাওনাদাররা কিন্তু আসলে এক-একটি রক্তখেকো বাঘ।

কর্নেল এবার তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হাসলেন।

॥ ২ ॥

পরদিন বিকেলে দৈনিক 'সত্যসেবক' পত্রিকার নিউজ রুমে বসে আড্ডা দিচ্ছি এমন সময় চিফ অফ দি নিউজ ব্যুরো সত্যদা হাঁক দিলেন—জয়ন্ত, তোমার ফোন।

একটু অবাক হয়েই সত্যদার টেবিলে গেলাম। আমার নিজের টেবিলে তো ফোন আছে অথচ সত্যদার ফোনে কে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়? কাছে যেতেই সত্যদা মুচকি হেসে চাপা স্বরে বললেন, তোমার ফ্রেন্ড ফিলজফার গাইড আমাকে জিগ্যেস করছিলেন জয়ন্তকে একা পাওয়া যাবে কি না? বললুম, না। কারণ, তোমার চারপাশে কচিকাঁচা ছেলেমেয়ে রিপোর্টাররা মাছির মতো ভনভন করছে।

হাসতে-হাসতে রিসিভার তুলে বললুম, হাই বস্, আমাকে একা পেতে চান, কিন্তু এখানেও তো আমি একা নই।

কর্নেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—তোমাকে কলকাতা ছেড়ে আমার সঙ্গে পাড়ি জমাতে হবে। কাজেই তোমার অফিসিয়াল অনুমতির দরকার।

—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। সত্যদা জানলে আমার অবাধ ছুটি।

—রিসিভারটা তোমার সত্যদাকে দাও, তারপর আশা করছি তুমি এখনি খাঁচা খুলে উড়ে আসতে পারবে।

ব্যাপারটা বোঝা গেল না। কর্নেলের কথামতো রিসিভার সত্যদাকে দিলুম। তারপর দেখলুম সত্যদা খুব মন দিয়ে কর্নেলের কথা শুনছেন আর

মাঝে-মাঝে বলে উঠছেন—'দারুণ!' 'ওরে বাবা', 'বলেন কী!' 'কী সর্বনাশ!' শেষে বললেন, জয়ন্ত যাচ্ছে। আমাদের নিউজ পেপার এবার একখানা দুর্ধর্ষ স্টোরি ছেপে হইচই ফেলে দেবে।

সত্যদা রিসিভার রেখে একগাল হেসে বললেন. উইশ য়ু গুডলাক জয়ন্ত। কর্নেল বুড়োর কথা শুনে মনে হল একেবারে রাঘব বোয়ালের কেস।

'সত্যসেবক' পত্রিকার অফিসের গ্যারেজ থেকে আমার ফিয়াট গাড়িটা বের করে নিয়ে যখন এগোচ্ছি তখনও আমার মাথায় ঢোকেনি কর্নেল কেন এমন করে ডাক দিলেন।

অফিস প্রাঙ্গণ পেরিয়ে গিয়ে তবে মনে পড়ল কাঞ্চনপুরের জমিদারবাড়ি র ঘটনা। গোয়েন্দাপ্রবর হালদারমশায়ের কোনও বিপদ হয়নি তো!

ফ্রি স্কুল স্ট্রিট হয়ে ইলিয়ট রোডে পৌঁছে একটা গলি রাস্তার পরই কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। গেট দিয়ে ঢুকে লনের একপাশে গাড়ি রাখলুম। তারপর তিনতলায় চলে গেলুম।

ডোরবেলের সুইচে আঙুল পড়তেই তক্ষুনি দরজা খুলে গেল। দেখলুম ষষ্ঠিচরণ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিসফিস করে বলল, বাবামশাইকে খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছে। আমাকে বলছিলেন তুই লক্ষ রাখবি তোর কাগজের দাদাবাবু আসছেন কি না।

কথাগুলো বলে ষষ্ঠি পাশের করিডর দিয়ে ভেতরে চলে গেল। আমি ছোট্ট ওয়েটিং রুমটার ভেতর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকলুম। দেখলুম কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে এক টুকরো কাগজে চোখ রেখেছেন। আমাকে দেখে তিনি নড়ে বসলেন।

—এই যে জয়ন্ত, আজ সকালেই ভাবছিলুম তোমাকে সোজা আমার কাছে চলে আসতে বলব। কারণ, কাঞ্চনপুরের ঘটনাটা যে ছোটখাটো নয় তা গতরাতেই টের পেয়েছিলুম। বলে তিনি হাঁক দিলেন, ষষ্ঠি, আমার জন্যও কফি আনবি।

সোফায় বসে এবার লক্ষ করলুম কর্নেলের মুখে উদ্বেগের ছাপ। চাপা-স্বরে বললুম, আমাদের হালদারমশায়ের কোনও বিপদ হয়নি তো?

কর্নেল অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, না। গত রাত্রে কাঞ্চনপুর থেকে হালদারমশাই আমাকে ফোন করেছিলেন। জমিদার বাড়িতে ফোন নেই। তাই উনি বাজারের একটা ফার্মেসি থেকে ফোন করেছিলেন।

—আহা-হা, ফোনে উনি কী বললেন তাই বলুন।

কর্নেল বললেন, হালদারমশায়ের মতে ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। রাত একটায় যে ভূতুড়ে কাণ্ডটা হয় তার পেছনে বাড়ির লোকেরই কারও হাত আছে। এদিকে হালদারমশায়ের ওখানে পৌঁছনোর পরে লেটার বক্সে একটা উড়ো চিঠি পাওয়া গেছে। তাতে কেউ লাল কালিতে লিখেছে—কলকাতা থেকে গোয়েন্দা এনেছ। গোয়েন্দার মাথায় দা চালিয়ে দেব। কথামতো কাজ না করলে তোমারও ধড়মুণ্ডু আলাদা হয়ে যাবে।

ষষ্ঠি ট্রেতে দু-পেয়ালা কফি আর স্ন্যাক্স রেখে গেল। কর্নেলের মুখে তখনও উদ্বেগের ছাপ।

কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললুম, এই সামান্য ব্যাপারে আপনি এত বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন কেন? বরাবর তো দেখা গেছে যত গর্জায় তত বর্ষায় না।

কর্নেল কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে তাঁর হাতের সেই টুকরো কাগজটা আমাকে দিলেন। যেমন-তেমন ভাবে ছেঁড়া কাগজটায় লাল কালিতে লেখা আছে—ব্যাটাচ্ছেলে এই বুড়ো বয়সেও বাঘের গুহায় মুখ ঢোকাতে আসছে। সাবধান! কাঞ্চনপুরের মাটিতে পা পড়লেই ঠেলাটা বুঝতে পারবে।

আমি না হেসে পারলুম না। বললুম, আমার খুব অবাক লাগছে কর্নেল। জীবনে কখনো এইসব তুচ্ছ ব্যাপারকে আপনি পাত্তা দেননি। এই হাস্যকর চিঠিটা নিশ্চয় আপনার লেটার বক্সে কেউ দিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল আস্তে 'হুঁ' বলে কফিপানে মন দিলেন। এই সময় ড্রয়িংরুমের দেওয়াল ঘড়িতে বিকেল চারটে বাজল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কর্নেল বললেন, জয়ন্ত, এ চিঠি বা হালদারমশায়ের ফোন পেয়ে আমি উদ্বিগ্ন হইনি। হয়েছি অন্য একটা কারণে। কাঞ্চনপুর জমিদারবাড়ির এই অদ্ভুত ঘটনা আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে একটা কারণে।

কর্নেল গম্ভীর মুখে চুরুট ধরালেন। বললুম, কারণটা কী তা বলতে আপত্তি আছে?

কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার টেনে খবরের কাগজের একগোছা কাটিং আমার হাতে তুলে দিলেন। খবরগুলো পুরোনো। তারিখ অনুযায়ী সাজানো আছে। শেষেরটার তারিখ বছর পাঁচেক আগেকার। সেইটার হেডিং-এ ছাপা হয়েছে কাঞ্চনপুর এস্টেটের নিরুদ্দিষ্ট ছোট শরিক হরকালী রায়ের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার তিনি একেবারে সশরীরে দিবালোকে আবির্ভূত হয়ে বলেছেন,

যে মিথ্যুকেরা তাঁর নামে মিথ্যা খবর রটিয়েছিল তাদের তিনি শায়েস্তা করবেন। কাঞ্চনপুরে হরকালীবাবু খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তাই সেখানকার লোকেরা তাঁকে জোর করে তাঁর বাড়ির অংশের দখল নিতে সাহায্য করেছিল। তারপরই কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। হরকালীবাবুকে আর দেখা যাচ্ছে না। তাঁর বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া নেই। তিনি যেমন আশ্চর্যভাবে এসেছিলেন, তেমনই আশ্চর্যভাবে উধাও হয়ে গেছেন। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। কিছু বৃদ্ধ লোকের মতে জমিদারবাড়ির উপাস্য দেবী কালিকার মন্দিরে নাকি বহু ধনরত্ন লুকানো আছে। হরকালীবাবুর মতো অবিকল দেখতে কোনও লোক সেই ধনরত্ন চুরি করতে এসেছিল। তার পেছনে অবশ্যই কোনও পাকাপোক্ত লোক আছে। তবে পুলিশ এইসব বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

এই খবরটা পড়ার পর বললুম, স্থানীয় সংবাদদাতারা কলকাতার কাগজে জায়গা পাওয়ার লোভে অনেক উদ্ভট খবর লিখে পাঠায় এবং তা ছাপাও হয়।

কর্নেল বললেন, তুমি ধৈর্য ধরে সবগুলো কাটিং যদি পড়ো তাহলে বুঝতে পারবে কাঞ্চনপুর জমিদারবাড়িতে সত্যিই একটা জটিল রহস্যময় ইতিহাস এখনও কাজ করে যাচ্ছে। গৃহদেবতার ধনরত্ন এসবের মূলে। বোঝা যাচ্ছে, সেই ধনরত্ন কোথায় আছে তার সন্ধান এখনও মেলেনি। জয়ন্ত, মানুষের সবচেয়ে লোভ গুপ্তধনে। গুপ্তধনের জন্য এযাবৎকাল সারা পৃথিবীতে মানুষ কীসব জঘন্যতম কাজ করেছে সে বিষয়ে আমার কাছে একটা বই আছে।

বললুম, ওঃ কর্নেল! এটুকু শুনেই আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। এবার শুধু বলুন আপনি কী করতে চান?

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন। তারপর হঠাৎ চোখ খুলে চাপাস্বরে বললেন, তুমি আর আমি আজ রাতের ট্রেনেই কাঞ্চনপুর যেতে চাই। তত বেশি দূর নয়। শিয়ালদা থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টার জার্নি। আমি ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের সুকুমারকে বলে সেখানকার ট্যুরিস্ট লজে একটা ডাবলরুমের ব্যবস্থা করতে পারি।

আমার মাথায় কর্নেলের মতোই জেদ চেপে গেল। বললুম, ঠিক আছে। আমি সল্টলেকে আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে রেডি হয়ে আসছি। আমার গাড়িটা আপনার খালি গ্যারেজেই রেখে দেব।

কর্নেল সোৎসাহে বললেন, বাঃ। আমি জানতুম তুমি আমার সঙ্গ ধরতে দ্বিধা করবে না। আমরা রাতে ডিনার খেয়ে বেরুব। ট্রেন ছাড়বে সোয়া

এগারোটায়। শেষ রাতে পৌঁছনোই ভালো।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, কিন্তু একটা কথা। আপনি কাঞ্চনপুর জমিদার-বাড়ির খবরের কাটিংগুলো এত বছর ধরে কেন রেখেছিলেন?

কর্নেল মৃদু হেসে বললেন, কাঞ্চনপুর গঙ্গার ধারেই। ওদিকে একটা বিশাল জলা আছে। একসময় ওখানে পাখি দেখতে যেতুম। শিবকালীবাবু, হরকালীবাবু জানেন না আমার বন্ধু ছিলেন ওঁদের বড় তরফ কালীরঞ্জন রায়। সম্পর্কে শিবকালীবাবুর জ্যাঠা। ওঁদের তিন শরিকের বাড়ি কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে তিনদিকে। অবশ্য সে প্রায় পনেরো বছর আগের কথা। কালীরঞ্জনবাবু বিয়ে করেননি। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়েছিলুম খবরের কাগজে। কারণ, উনি এলাকার একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তা ছাড়া, কলকাতার একটা রাইফেল শ্যুটিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। রাইফেল শ্যুটার হিসেবে সারা দেশে তাঁর খ্যাতি ছিল। যাই হোক, ওসব কথা পরে শুনবে। এখন তুমি তোমার ফ্ল্যাটে গিয়ে রেডি হয়ে এসো। হ্যাঁ, সঙ্গে কিন্তু গরম পোশাক নেবে। কলকাতায় এই নভেম্বরে শীত পড়েনি। কিন্তু কাঞ্চনপুর এখন শীতে কাঁপছে। আর একটা কথা। তোমার আগ্নেয়াস্ত্রটা সঙ্গে নিতে ভুলো না।

বললুম, সর্বনাশ! খুনোখুনির পাল্লায় পড়তে হবে নাকি?

—হতেও পারে। বলে কর্নেল খবরের কাটিংগুলো গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত হলেন।

আমি তখনই বেরিয়ে এলুম। পার্ক সার্কাস ধরে ই এম বাইপাসে পৌঁছে এবার হঠাৎ কেন যেন একটা গোপন আতঙ্কের শিহরন জাগল শরীরে। কর্নেলকে কোনও ঘটনা এতবেশি গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করতে দেখিনি। তাঁর সঙ্গে এযাবৎকাল ঘুরে এ ধরনের বহু পরিবারে গৃহদেবতার গুপ্তধনের রহস্যে জড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু কখনও কর্নেলকে তা নিয়ে এত ব্যস্ত হতে দেখিনি। কাজেই মনে হচ্ছে কাঞ্চনপুরের জমিদার বাড়িতে পূজ্যা মা কালীর ধনরত্ন নেহাত গুজব নয়। তা ছাড়া, কর্নেলকে এর মধ্যেই কেউ উড়ো চিঠিতে ভয় দেখিয়েছে।

আবার মনে আতঙ্ক জাগল। আমি সতর্কভাবে গাড়ি ড্রাইভ করছিলুম।

॥ ৩ ॥

এযাবৎকাল যেখানে গেছি লক্ষ করেছি কর্নেল লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আগে থেকেই সব আয়োজন করে রাখেন। রাতের ট্রেন কিছুটা লেট করেছিল কিন্তু

কাঞ্চনপুর স্টেশনে পৌঁছে দেখি পুলিশ পোস্ট থেকে আমাদের জন্য গাড়ি পাঠানো হয়েছে।

আর কর্নেল যা বলেছিলেন তার সত্যতাও হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলুম, সেই শেষ রাত্রে ঘন কুয়াশা আর হিম করা শীত। ড্রাইভারের নাম কালীপদ শুনে জানতে চেয়েছিলুম সে কাঞ্চনপুর জমিদারবাড়ির কেউ কি না। লোকটি খুব বিনয়ী। মাথা নেড়ে বলেছিল, আজ্ঞে না স্যার। ওঁরা বামুন আর আমি হলুম শুদ্দুরের ছেলে। তবে আমাদের ওখানে জমিদারবাবুদের গৃহদেবতা কালীর ওপর সারা এলাকার লোকের খুব ভক্তি আছে। তাই এখানে কালী নামের খুব ছড়াছড়ি। তবে হ্যাঁ, সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবী, স্যার।

স্টেশন এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে গাঢ় অন্ধকার। ঘন কুয়াশাও লক্ষ করলুম। কর্নেলকে বললুম, ট্যুরিস্ট লজ অবধি আলো থাকা উচিত ছিল।

কালীপদ বলল, আলো পরে হবে স্যার, শুনেছি। আমাদের লজ কাঞ্চনপুর থেকে একটুখানি দূরে। একটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলে ডাইনে পড়বে শঙ্খদহ ঝিল। বিশাল ঝিল। এই শীতে নানারকম পাখি আসে। এই পাখি দেখতে ট্যুরিস্টরা আসে। তাই ট্যুরিস্ট লজ করা হয়েছে গঙ্গার ধারে।

এই ড্রাইভারটি বিনয়ী হলেও বড় বেশি কথা বলে। হেডলাইটের আলোয় লক্ষ করছিলুম মোরাম বিছানা রাস্তার দু-ধারে কুয়াশা-ঢাকা ঘন জঙ্গল।

কর্নেল এতক্ষণ চুপচাপ চুরুট টানছিলেন। চুরুটের ধোঁয়ায় গাড়ির ভেতরটা পাছে কটু হয়ে ওঠে তাই তিনি তাঁর দিকের জানলা নামিয়ে দিয়েছিলেন। এবার তিনি বললেন, আচ্ছা কালীপদ, জমিদারবাড়ির এক শরিক নাকি মরে যাওয়ার পর জ্যান্ত হয়ে ফিরে এসেছিল?

কালীপদ বলল, হ্যাঁ স্যার। আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, তবে ঘটনা সত্যি। ইদানীং শুনছি তিনিই নাকি আবার মরে গিয়ে দুই ভাইপোকে ভূত হয়ে ভয় দেখাচ্ছেন।

কালীপদ কথাটা বলে হেসে উঠল! জিগ্যেস করলুম, তাহলে এবার তিনি আগের মতো জ্যান্ত হয়ে ফিরতে পারেননি?

কালীপদ তখনই গম্ভীর হয়ে গেল। গাড়ির ড্যাশবোর্ডের আলোয় লক্ষ করলুম তার মুখে যেন আচমকা ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে।

সে চাপাস্বরে বলল, জমিদারবাড়িতে সত্যি এবার ছোট শরিক হরকালীবাবুর প্রেতাত্মা হানা দিয়েছে। শুনেছি, ও তল্লাটে দিনদুপুরেও একলা যেতে লোকে

ভয় পাচ্ছে।

কথাটা বলেই সে চুপ করে গেল। একটু পরেই সামনে একটু উঁচু জায়গার ওপর আলোর ছটা দেখতে পেলুম। জঙ্গল পেরিয়েই দেখলুম রাস্তাটা উঁচু হতে-হতে বাংলোর গেটে পৌঁছেছে?

এতক্ষণ পরে আলো দেখে অস্বস্তি কেটে গেল। কালীপদ একবার হর্ন দিতেই কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা লোক বেরোল। গেটের পাশে ছোট্ট একটা ঘর। বুঝতে পারলুম ওখানেই লোকটা থাকে। সে গেট খুলে দিলে আমাদের গাড়ি বাংলোর সামনে পৌঁছল।

চওড়া বারান্দায় প্যান্টকোর্ট পরে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়ি থেকে আমাদের নামতে দেখে তিনি করজোড়ে নমস্কার করে বললেন, কোনও অসুবিধা হয়নি তো, স্যার?

কর্নেল বললেন, না। ট্রেন একটু লেট ছিল, এই যা। আপনার নাম সুরঞ্জন চক্রবর্তী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। আমি বাংলোর কেয়ারটেকার। আপনাদের জন্যে দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি স্যুইট খালি রেখেছি। বাকি সব ভরতি।

সুরঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমরা দোতলায় গেলুম। একটা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে তিনি বললেন, কলকাতা থেকে আমাদের সাহেব বলে পাঠিয়েছেন আমি যেন কফির ব্যবস্থা রাখি।

কর্নেল হাসিমুখে বললেন, রাত সাড়ে তিনটেয় এক কাপ কফি পেলে মন্দ হত না, কিন্তু—

সুরঞ্জনবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, কোনও কিন্তু নয় স্যার। সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, কোনও অসুবিধা হবে না।

ইতিমধ্যেই ঘরের আলো তিনি জ্বেলে দিয়েছিলেন। বেশ চওড়া ঘর। দু-দিকে দুটো সিঙ্গল খাট। খাটে মশারি গোঁজা আছে। কর্নেল তাঁর কাঁধের বোঁচকা কোণের একটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। তারপর পিঠে আঁটা কিটব্যাগটাও খুলে ফেললেন।

আমি উলটো দিকের খাটের পাশের টেবিলে আমার ব্যাগটা রেখে বললুম, গঙ্গা কোন দিকে?

কর্নেল মুচকে হেসে বললেন, মা গঙ্গার দর্শন এখন পাবে না। তিনি কুয়াশার আড়ালে ঘুমোচ্ছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরঞ্জনবাবু একজন পরিচারকের সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। পরিচারকের হাতে একটা ট্রে, তাতে দু-পেয়ালা কফি আর পোটাটো চিপ্‌স।

কর্নেল বললেন, ধন্যবাদ সুরঞ্জনবাবু। আর আপনাদের জ্বালাতন করছি না।

সুরঞ্জনবাবু করজোড়ে বললেন, বড়সাহেব বলে দিয়েছেন কর্নেল সাহেবের যেন এতটুকু অসুবিধা না হয়। আচ্ছা, গুড নাইট স্যার।

ওঁরা চলে গেলেন। কর্নেল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে কয়েকটা জানলা খুলে দিলেন। তারপর একটা জানলার পরদা সরিয়ে বললেন, আশা করি এই জানলা দিয়ে হরকালীবাবুর ভূত সুদে-আসলে লাখ টাকা চাইতে আসবেন না।

জিগ্যেস করলুম, কেন?

—এদিকটায় মা গঙ্গা। ভূতেরা গঙ্গাপ্রাপ্তি পছন্দ করে না। তারা ভূত হয়েই থাকতে চায়। যাক্‌গে, আগে কফি খেয়ে নিই, তারপর শুয়ে পড়া যাবে।

সত্যি বলতে কী টানা প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ট্রেন-জার্নির পর প্রচণ্ড শীতে এখানে পৌঁছে কফির উষ্ণতা খুব আনন্দ দিচ্ছিল।

কর্নেলের সঙ্গে যেখানেই গেছি, দেখেছি তাঁর সব আয়োজনই নিখুঁত থাকে। সামরিক জীবনের শৃঙ্খলাবোধই বোধহয় এর কারণ। কফি খেয়ে পোশাক বদলে মশারির ভেতর শুয়ে পড়েছিলুম। কর্নেলের কথামতো আমার রিভলভারটা বালিশের পাশে রাখতে ভুলিনি। তারপর কর্নেলের নাকডাকা শুনতে-শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ চাপাগলায় বলছে, আটটা বাজে, স্যার। বেড-টি এনেছি। তখনই উঠে বসলুম। বুঝতে পারলুম ওপাশের মশারির ভেতর কর্নেল নেই। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন এবং আমার জন্য বেড-টির কথা বলে গেছেন। বললুম, দরজা খোলা আছে, চলে এসো।

পরদার ফাঁক দিয়ে দেখলুম বাইরে ম্রিয়মাণ রোদ। তখনও কুয়াশা মুছে যায়নি। পরিচারকটি বিছানার পাশে চা রেখে বিনীতভাবে বলল, আপনার মশারি তুলে দিই, স্যার। তাহলে চা খেতে সুবিধা হবে।

সে আমার বলার অপেক্ষা না করেই মশারি তুলে ওপরে রেখে দিল। কম্বলের মধ্যে কোমর ডুবিয়ে বসে বেড-টিতে চুমুক দিলুম।

লোকটি বলল, আমার নাম স্যার পঞ্চানন। তবে লোকে আমাকে পাঁচু বলেই ডাকে। ম্যানেজারবাবু আপনাদের সেবার জন্য আমাকে ঠিক করেছেন।

এই যে সুইচটা দেখছেন এটা টিপলে আমি তক্ষুনি এসে হাজির হব।

বলে সে বেরিয়ে গেল। তারপরই আমার চোখ গেল বালিশের পাশে আমার আগ্নেয়াস্ত্রটার দিকে। সর্বনাশ! অস্ত্রটা তো পাঁচু নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছে। সে মশারি ওঠানোর সময় অস্ত্রটা একটু সরে গেছে। অবশ্য এতে উদ্বেগের কিছু নেই। বরং এখানকার অন্তত একটা লোক যখন দেখেছে আমার কাছে কী সাংঘাতিক অস্ত্র আছে, তখন যদি সে দৈবাৎ শত্রুপক্ষের লোকও হয়, ভয় পাবে।

কর্নেল ফিরলেন আধঘণ্টা পর। ততক্ষণে আমি পোশাক বদলে পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করছিলুম। কর্নেল ঘরে ঢুকে বললেন, ওই দরজাটা বন্ধ করে ভেতরে এসো জয়ন্ত।

ওঁর নির্দেশ পালন করে বললুম, আপনার দাড়িতে মাকড়সার জাল লেগে আছে। আর টুপিতে কী সব বিশ্রী জিনিস। আপনি কি প্রজাপতি ধরতে ঝোপে ঢুকেছিলেন।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, নাহ্! জঙ্গলের ভেতরে এখানে একটা শিবমন্দির আছে। ভাঙাচোরা মন্দির। সেখানে কেউ বসে ছিল। দূর থেকে বাইনোকুলারে লক্ষ করেই আমি তার কাছে যেতে চেয়েছিলুম। কিন্তু লোকটার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। আমাকে চুপিচুপি আসতে দেখেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চমকে উঠেছিলুম। বললুম, ব্যাপারটা তাহলে সন্দেহজনক। তা না হলে সে পালাবে কেন?

কর্নেল মাথার টুপি খুলে চাপাস্বরে বললেন, লোকটা একজন সাধুবাবা। আমি ভেবেছিলুম আমাদের হালদারমশাই কোনও কারণে সাধুর ছদ্মবেশে ওখানে বসে আছেন। কিন্তু দেখা গেল লোকটা হালদারমশাই নয়। যাই হোক, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমি পোশাক বদলে নিই। এখনই ব্রেকফাস্ট এসে যাবে।

বলে পিঠের কিটব্যাগ খুলে রেখে টুপি ঝাড়তে-ঝাড়তে কর্নেল বাথরুমে ঢুকলেন। একটু পরেই সেই পাঁচু ট্রেতে ব্রেকফাস্টের খাদ্য নিয়ে এল। মাঝের টেবিলে রেখে সে বলল, কফি রেডি আছে স্যার, ঠিক সময়ে নিয়ে আসব।

কথাটা বলে সে গোঁফের একটা পাশ চুলকে নিল। তারপর দাঁত বের করে নিঃশব্দে হেসে বলল, একটা কথা জিগ্যেস করব, দয়া করে অপরাধ নেবেন না, স্যার।

গম্ভীর মুখে বললুম, বলো!

—আপনার বালিশের কাছে যে অস্তরটা দেখলুম, তা স্যার আমাদের কাঞ্চনপুরে রক্ষাকালীবাবুর কাছেও আছে। ওনারা জমিদার ছিলেন, স্যার। আমি একসময় ওনার বাড়িতে কাজ করতুম, তাই দেখেছিলুম।

এই সময় কর্নেলকে বেরিয়ে আসতে দেখে জিভ কেটে তাঁকে সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল।

কর্নেল দাড়িতে চিরুনি চালিয়ে চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, শ্রীমান পঞ্চানন ওরফে পাঁচু তোমাকে কী যেন বলছিল?

অগত্যা কর্নেলকে ব্যাপারটা খুলে বলতেই হল। কর্নেল ব্রেকফাস্ট করতে-করতে বললেন, যা ঘটে অনেক সময় তা ভালোর জন্যই ঘটে। শিবকালীবাবু আমাদের বলেছেন তাঁর দাদা রক্ষাকালীবাবুর একটা বন্দুক আছে। কিন্তু তাঁর একটা পিস্তল বা রিভলভারও যে আছে সেটা পাঁচুর মুখে জানা গেল।

কর্নেল একটু পরে আবার বললেন, একজন লোকের কাছে সরকারের পক্ষে পুলিশ একটা আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দিতে পারে। সচরাচর বন্দুকের লাইসেন্সই দেওয়া হয়। বিশেষ-বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কাউকে রিভলভাব বা রাইফেলের লাইসেন্স দেওয়া হয়। এখন দেখা যাচ্ছে, রক্ষাকালীবাবুর কাছে দুরকম অস্ত্রই আছে। আমার ধারণা জয়ন্ত, পাঁচু তাঁর কাছে যে অস্ত্রটা দেখেছে সেটার কোনও লাইসেন্স নেই। কারণ, রক্ষাকালীবাবু এ অঞ্চলে তেমন কোনও গণ্যমান্য লোক নন। বন্দুকটা ছিল তাঁর বাবার। তিনি সেই সূত্রে সেটা রাখতে পেরেছেন।

বললুম, শিবকালীবাবুকে জিগ্যেস করে দেখবেন।

কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন, চুপ। সবসময় মুখটি বুজে থাকবে।

এই সময় পাঁচুর সাড়া পাওয়া গেল। সে কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর সেলাম দিয়ে বলল, সব ঠিক আছে তো, স্যার।

কর্নেল তার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা পাঁচু, জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা শিবমন্দিরে একজন সাধুবাবাকে দেখলুম।

পাঁচু নিঃশব্দে হেসে বলল, উনি এক পাগলাবাবা, স্যার। কিছুদিন থেকে এই জঙ্গলে অনেকে ওঁকে দেখতে পেয়েছে। আমিও একদিন দেখেছিলুম। কিন্তু ওনার এক অদ্ভুত স্বভাব, কেউ কাছে গেলে অমনি জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। আপনি কি তাঁকে দেখতে পেয়েছেন, স্যার?

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। আমাকে দেখেই সাধুবাবা যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পাঁচু দরজার বাইরে উঁকি মেরে দেখে এল। তারপর চাপাস্বরে বলল, স্যার, আমার সন্দেহ উনি জমিদারবাড়ির সেই ছোট শরিক হরকালীবাবু। একবার উনি নাকি মারা গিয়েছিলেন। তারপর নাকি জ্যান্ত হয়ে—

কর্নেল শুধু বললেন, জানি।

॥ ৪ ॥

সেই সাধুবাবা যে হরকালীবাবু, কর্নেল তা কেমন করে জানলেন—এই প্রশ্নটার জবাব কর্নেল আমাকে স্পষ্ট করে দেননি। শুধু বলেছিলেন, পাঁচুর যেমন সন্দেহ, আমারও সেই সন্দেহ। তবে তিনি সত্যি হরকালীবাবু হলে আমাদের একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। কারণ, আমার বিবেচনায় পাগলদের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো।

কফি খাওয়া শেষ করে কর্নেল কিছুক্ষণ চুরুট টানলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো, এবার বেরুনো যাক।

তিনি সুইচ টিপে পাঁচুকে ডাকলেন। তারপর পাঁচু এসে ব্রেকফাস্টের ট্রে এবং কফির পেয়ালা গুছিয়ে নিল।

কর্নেল বললেন, আমরা কিছুক্ষণের জন্য বেরুব।

পাঁচু হাসিমুখে জিগ্যেস করলে, পাখি দেখতে যাবেন নাকি স্যার?

কর্নেল বললেন, পাখি দেখতে ও বেলা যাব। এ বেলায় আমরা তোমাদের কাঞ্চনপুর দেখতে বেরুচ্ছি।

পাঁচুর মুখে মনে হল কোনও প্রশ্নের ছাপ আছে। কিন্তু সে চুপচাপ বেরিয়ে গেল।

কর্নেল পিঠে তাঁর কিটব্যাগ আটকে নিয়ে গলায় ক্যামেরা আর বাইনোকুলার ঝুলিয়ে নিলেন। তারপর দুজনে বেরিয়ে গেলুম। দরজায় তালা এঁটে কর্নেল বললেন, এই পাঁচু লোকটির দিকে আমাদের লক্ষ রেখে চলতে হবে।

বললাম, কেন? লোকটি তো খুব কাজের বলেই মনে হয়। কারণ, তার কাছে রক্ষাকালীবাবুদের অনেকরকম খবর পাওয়ার চান্স আছে। তাকে বরং

বকশিশ দিয়ে কথাচ্ছলে নানা প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়া যাবে।

কর্নেল টানা বারান্দায় হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, জয়ন্ত, আমরা কলকাতা থেকেই পেছনে শত্রু নিয়ে এখানে এসেছি। কাজেই আমাদের সারাক্ষণ সাবধানে এবং হিসেব করে পা ফেলতে হবে। আশা করি আমার কথার অর্থ বুঝতে পেরেছ।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে যেতেই সুরঞ্জনবাবু নমস্কার করে বললেন, এবার নিশ্চয় আপনার গাড়ির দরকার হবে, স্যার?

কর্নেল বললেন, না। পায়ে হেঁটে বেরোলে অনেক কিছু দেখা যায়। আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। কাজেই পায়ে হেঁটে বেড়ানোর চেয়ে আনন্দ আর কিছুতে নেই।

গেট পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন ভদ্রলোক। তারপর চাপা স্বরে বললেন, যদি পাখি দেখতে চান তাহলে জঙ্গলের পথে একটু লক্ষ রেখে যাবেন। কারণ কয়েকজন ট্যুরিস্ট ভদ্রলোক বলছিলেন জঙ্গলে নাকি এক পাগলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আচমকা ঢিল ছুড়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আমরা পাখি দেখতে যাচ্ছি না। কাঞ্চনপুরে এক বন্ধুর বাড়ি, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তাঁকে আপনি চিনবেন না। কারণ তিনি বাইরের লোক। সদ্য এখানে সরকারি চাকরিতে বদলি হয়ে এসেছেন।

বাংলোটা উঁচু মাটির ওপর তৈরি। মরশুমি ফুলে এবং দেশি-বিদেশি গাছপালায় সুন্দরভাবে সাজানো। গেট থেকে নেমে মোরাম রাস্তায় পৌঁছে কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, জয়ন্ত, এই বাংলোর কেয়ারটেকার কাম ম্যানেজার ভদ্রলোকও পাঁচুর মতো কৌতূহলী।

বলে তিনি মোরাম রাস্তার ডানদিকে হাঁটতে থাকলেন। আমরা গত রাত্রে স্টেশন থেকে এসেছিলুম এই রাস্তার বাঁ-দিক থেকে। রাস্তাটা বাংলোর সামনে একটা কোণ রচনা করেছে। বুঝতে পারলুম আমরা চলেছি কাঞ্চনপুরের দিকে। দু-ধারে লাল ধুলোয় ভরা ঝোপঝাড় আর উঁচু গাছপালা।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর কর্নেল বললেন, ডানদিকে ওই যে বাঁধ দেখতে পাচ্ছ ওটার নীচেই গঙ্গা। তবে আমরা এখন গঙ্গাদর্শনে যাচ্ছি না।

এতক্ষণে বাঁ-দিকে একটা আমবাগান দেখতে পেলুম। কর্নেল রাস্তা ছেড়ে সেই আমবাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকলেন। জিগ্যেস করলুম, আমরা

এদিকে কোথায় যাচ্ছি?

কর্নেল বললেন, শর্টকাটে এবং অন্যের অলক্ষে জমিদারবাড়িতে পৌঁছতে চাই।

আমবাগান পেরিয়ে গিয়ে দেখলুম বিশাল সব দালানবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। একখানি পায়ে চলা পথ দেখা গেল। সেই পথে হাঁটতে-হাঁটতে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটা দোতলা বাড়ি গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল।

কর্নেল পাঁচিলের ধারে-ধারে পায়ে চলা পথটা ধরে এগিয়ে গেলেন। মাঝে-মাঝে তিনি বাইনোকুলারে এপাশ-ওপাশ দেখে নিচ্ছিলেন। একটু পরেই পাঁচিলটা শেষ হল। সেখানে একটা ভাঙাচোরা দেউড়িতে গরাদ দেওয়া কপাট আটকানো ছিল। গেটের কাছে পৌঁছুতেই ভেতর থেকে হেঁড়ে গলায় কেউ বলল, শিবু,—ও শিবু—আমাদের গেস্ট এসে গিয়েছেন মনে হচ্ছে।

এতক্ষণে দেখলুম দোতলার জানলায় একটা গুঁফো মুখ। নাকটা বেজায় খাড়া। চোখ দুটো কেমন যেন অস্বাভাবিক লাল। গলাবন্ধ কোট পরে ভদ্রলোক সম্ভবত কারুর প্রতীক্ষা করছিলেন।

এই সময় শিবকালীবাবুকে দেখতে পেলুম। তিনি হাসিমুখে আমাদের নমস্কার করে গেটের তালা খুলে দিলেন। তারপর বললেন, মিস্টার হালদারের কাছে খবর পেয়েছি আপনি আজকে আসবেন।

আমরা ভেতরে ঢুকলে তিনি গেটে ফের তালা এঁটে দিলেন। তারপর আমাদের সঙ্গে নিয়ে দোতলার নীচের একটা ঘরে উঠলেন। ঘরে সেকেলে আসবাব। জমিদারবাড়ির তেমন কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না। তবে সামনের দিকে একটা বিশাল দালানের ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল। আমার অবাক লাগছিল এই ধ্বংসপুরীর মধ্যে এঁরা দুই ভাই বাস করেন কীভাবে।

শিবকালীবাবু বললেন, ভোলা এখনই এসে পড়বে। তাকে বাজারে পাঠিয়েছি। সে এলে আপনাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা হবে।

কর্নেল সোফায় বসে বললেন, আমাদের হালদারমশাই কোথায়?

শিবকালীবাবু নীরস মুখে বললেন, ভদ্রলোককে নিয়ে এক ঝামেলায় পড়েছি। উনি সব সময়ই এই ধ্বংসপুরীর সবখানে ওত পেতে বেড়াচ্ছেন। একবার ঠাকুরবাড়িতেও ঢুকেছিলেন। তবে পাঁচিল ডিঙিয়ে।

কর্নেল হাসলেন, প্রাইভেট ডিটেকটিভদের কাজকর্ম দেখে আপনাদের অবাকই লাগবে। কিন্তু তিনি এখন কোথায়?

শিবকালীবাবু বললেন, ভোরে একবার বেরিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ আগে ব্রেকফাস্ট করে আবার বেরিয়ে গেলেন। গেট দিয়ে বেরোননি। ওই ধ্বংসপুরীর ভেতর দিয়ে কীভাবে বেরুলেন কে জানে!

এই সময় ওপর থেকে সেই ভদ্রলোক নেমে এলেন। তাঁর হাতে একটা বন্দুক। কাছাকাছি দেখে এবার মনে হল ভদ্রলোক সম্ভবত নেশাভাঙ করেন এবং মাথায় একটু ছিটও আছে। তিনি হাত বাড়িয়ে কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার পর আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। টের পেলাম দেখতে বৃদ্ধ হলেও ওঁর গায়ের জোর আছে। এবার উনি কর্নেলের কাছাকাছি ধপাস করে বসে বন্দুকটা পাশে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন, আপনি যে প্রাইভেট গোয়েন্দাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে নাকি কেউ উড়ো চিঠি দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছে। একটু টের পেলেই তাকে আমি কুকুরের মতো গুলি করে মারতুম।

শিবকালীবাবু বললেন, দাদা, তোমরা কথা বলো। আমি দেখি ভোলা এত দেরি করছে কেন।

শিবকালীবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর তাঁর দাদা রক্ষাকালীবাবু আত্মপরিচয় ঘোষণা করলেন, কর্নেলসাহেব, আমি সেই রক্ষাকালী রায়। এই এলাকার লোক একসময় আমার দাপটে তটস্থ থাকত। এই যে আমার হাতে বন্দুক দেখছেন, এই বন্দুক কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু এই কিছুদিন থেকে কোন ব্যাটা আমার শোওয়ার ঘরের জানলার কাছে এসে ভয় দেখাচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার, তার গায়ে গুলি লাগে না।

কর্নেল নিবে যাওয়া চুরুটটা লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে বললেন, বাড়িতে কি আপনাদের ফ্যামিলি নেই?

রক্ষাকালীবাবু রুষ্ট মুখে বললেন, আমি বিয়ে করেছিলুম। রোগে ভুগে আমার স্ত্রী মারা পড়লেন। তারপর আর বিয়ে করিনি। সংসারের অনেক ঝামেলা। তবে শিবুর স্ত্রী পুত্র কন্যা আছে। তারা থাকে কাঞ্চনপুরের ভেতরে। শিবুর শ্বশুর পয়সাওয়ালা লোক। মেয়ে আর নাতিপুতিদের নিজের কাছেই রেখেছেন। শিবু মাঝে-মাঝে গিয়ে সেখানে থাকে, আবার এখানেও কিছুদিন কাটিয়ে যায়। আসলে ব্যাপারটা খুলে বলি। আমাদের এই পূর্বপুরুষের ভিটে যাতে বেদখল না হয়ে যায় তাই আমরা এখানে পাহারা দিচ্ছি। আর ওই গৃহদেবতা মা কালী। আমরা সরে গেলে তাঁর কী হবে? একজন সেবাইত রেখেছি। সে সকাল-সন্ধ্যায় এসে পুজোআচ্চা করে যায়। একটু অপেক্ষ করুন। মাকে দর্শন করাব।

কর্নেল বললেন, রক্ষাকালীবাবু, আমার হাতে সময় কম। আমি এই বাড়িটার পেছন দিকটা একবার দেখে আসতে চাই।

রক্ষাকালীবাবু বললেন, তা যান। গোয়েন্দাবাবুও তন্নতন্ন দেখেছেন। আপনিও দেখে আসুন। আমি এই বারান্দায় রোদ্দুরে চেয়ার পেতে বসছি। চারিদিকে শত্রু ওত পেতে আছে কিনা, তাই আমাকে তক্কে-তক্কে থাকতে হয়।

কর্নেল বেরিয়ে গিয়ে উঁচু বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠোনে নামলেন, তারপর বাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলুম।

পেছন দিকটা একসময় যে ঝোপঝাড়ে ভরতি ছিল তা বোঝা গেল। ভৌতিক উপদ্রবের পর সম্ভবত সেগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু পাঁচিলের ধারে প্রকাণ্ড সব গাছ। সেই গাছগুলোর ডাল দোতলার জানলার কাছে পৌঁছে গেছে। কাজেই সেই ডাল বেয়ে কেউ এসে ভূতুড়ে উৎপাত করতেই পারে।

কর্নেলের এক বদ অভ্যাস, কিছু দেখতে হলে সবসময়ই বাইনোকুলারে চোখ রাখা চাই। গাছের ডাল বেয়ে এসে ফিসফিস করে 'সুদে-আসলে এক লাখ' কথা কেউ বলতে পারে এই শুনে কর্নেল বাইনোকুলার নামালেন। তারপর মুচকে হেসে বললেন, তা পারে। তবে তার রক্ষাকালীবাবুর বন্দুকের গুলিতে মারা পড়ার চান্স আছে।

বলে তিনি দেওয়ালের কাছে গিয়ে আবার বাইনোকুলারে দোতলার দিকটা দেখতে থাকলেন।

এই সময় শিবকালীবাবু হন্তদন্ত এসে বললেন, কিছু বুঝতে পারলেন কর্নেলসাহেব?

কর্নেল বললেন, নাহ্! আপনার ভোলাকে পেলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার জন্য চা-টা করতে বলেছি। আপনার কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে। কিন্তু ভোলা কফি করতে পারে না। আর আমি তো একেবারে নিষ্কর্মা।

কর্নেল বললেন, আমরা উঠেছি ট্যুরিস্ট বাংলোতে। যদি যোগাযোগ করতে হয় সেখানেই করবেন। আর আমরা পেটপুরে ব্রেকফার্স্ট করেই বেরিয়েছি।

নীচের তলার একটা ঘরে ভোলা কেরোসিন কুকার ধরাচ্ছিল। চায়ের কেটলি চাপিয়ে সে বারান্দায় এল এবং আমাদের করজোড়ে নমস্কার করল। লোকটার চেহারা দৈত্যের মতো কিংবা গরিলা বলাই ভালো। কারণ, গায়ের

রং কুচকুচে কালো। এ বাড়িতে গোঁফের ছড়াছড়ি। তার গোঁফও দেখার মতো। মাথার চুল খুঁটিয়ে কাটা।

শিবকালীবাবু বললেন, ভোলা, তুই চা-ফা করে নিয়ে আয়। আমরা বসার ঘরে যাচ্ছি। দাদা কোথায় গেল?

ভোলা বলল, ওনার বাতিক। বসেই ছিলেন, হঠাৎ ঠাকুরবাড়ির দিকে দৌড়ে গেলেন।

শিবকালীবাবু কথাটা শুনেই বললেন, আপনারা ওই ঘরে বসুন, স্যার। আমি দেখি দাদা ওদিকে কেন গেল।

বাড়িটা দক্ষিণদুয়ারি। বারান্দা থেকে দক্ষিণে ঠাকুরবাড়ির মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। কিন্তু ওদিকের দেওয়ালের পাশে ঘন ঝোপ-জঙ্গল। তাই কোনও দরজা দেখা যায় না।

কর্নেল সেদিকে তাকিয়ে বললেন, এসো তো জয়ন্ত, গিয়ে দেখি রক্ষাকালীবাবু কাকে গালাগালি করছেন।

ভোলা বাঁকা মুখে বলল, রায়বংশে পাগলের অভাব নাই, স্যার।

কিন্তু কর্নেল হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। আমি তাঁর পেছনে।

॥ ৫ ॥

দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দেখি সামনে একটা মন্দির আর তার ওধারে একটা পুকুর। পুকুরের তিন পাড়ে ধ্বংসাবশেষ আর ঝোপ-জঙ্গল। মন্দিরের নীচের চত্বরে দাঁড়িয়ে বন্দুকের নল তুলে রক্ষাকালীবাবু কাকে শাসাচ্ছিলেন—আবার যদি তোকে এখানে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখি, বন্দুকের গুলিতে তোর মাথা ফুটো করে দোব।

শিবকালীবাবু তাঁর দাদাকে ধরে টানাটানি করছিলেন—আঃ। দিনদুপুরে খোমোকা হইচই বাধিও না তো। তোমার চোখের ভুল।

রক্ষাকালীবাবু আমাদের দেখতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, বুঝলেন কর্নেলস্যার, কিছুদিন থেকে এখানে এক পাগলা সাধুর উৎপাত শুরু হয়েছে। ট্যুরিস্ট লজের পাঁচু একসময় আমার এখানে কাজ করত। সেদিন সে বলে গেল ওদের ওখানে এক পাগলা সাধু উৎপাত করে বেড়াচ্ছে।

আমাকে সে সাবধান করে দিতে এসেছিল। পাগলার কাজই হল আড়াল থেকে ঢিল ছোড়া।

কর্নেল বললেন, এখন তাকে দেখলেন কোথায়?

রক্ষাকালীবাবু বললেন, ওই দরজায় কে এসে ধাক্কা দিচ্ছিল। আমি দৌড়ে এসে দরজা খুলতেই বজ্জাতটা পালিয়ে গেল। তারপর পুকুরের ওপাড় থেকে ঢিল ছুড়তে শুরু করল। ওই দেখুন কত ঢিল পড়ে আছে।

শিবকালীবাবু বললেন, ঢিল কী বলছ, এসব ইটের টুকরো। ওই দিকটায় আমার বড় জেঠা কালীরঞ্জনবাবুর বাড়ি ছিল।

কর্নেল বাইনোকুলারে এদিকটা দেখে নিয়ে বললেন, চলুন। আপনার বন্দুক দেখেছে, কাজেই পাগলাবাবা আর এদিকে আসবে না।

আমরা বাড়ির ভেতরে ঢুকলুম। ভোলা বলল, সেই পাগলা সাধু আমাদের এ তল্লাটেও উৎপাত করতে আসছে বুঝি? ওকে দেখতে পেলে পাগলামি ঘুচিয়ে দোব। আসুন স্যার, চা রেডি করে ফেলেছি।

সেই বসার ঘরে ঢুকে দেখি চার কাপ চা আর সম্ভবত আমাদের জন্য দুটো প্লেটে সন্দেশ রাখা আছে। আমরা সন্দেশ খেলুম না তবে হাঁটাহাঁটি এবং উত্তেজনার পর এই ঠান্ডার দিনে গরম চা তারিয়ে-তারিয়ে খেতে থাকলুম।

শিবকালীবাবু বললেন, বাড়ির পেছনে কি তেমন সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল কর্নেলস্যার?

কর্নেল বললেন, না। দোতলার অত উঁচু জানলার কাছে জলজ্যান্ত মানুষ রাতদুপুরে উৎপাত বাধাবে এটা অসম্ভব মনে হল।

রক্ষাকালীবাবু ফুঁ দিয়ে-দিয়ে চা খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, শিবুকে আমি বলেছিলুম, একটা ইলেকট্রিক তার জানলার পেছন দিকে টাঙিয়ে রাখতে। ভোলা ইলেকট্রিকের কাজ শিখে ফেলেছে। সে রাত্তিরে সুইচ টিপে তারটায় কারেন্ট চালু রাখবে আর যে ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে ভয় দেখাতে আসে শক খেয়ে ধপাস করে পড়ে যাবে।

শিবকালীবাবু বললেন, কিন্তু তাতে যে আমরা মানুষ খুনের দায়ে পড়ব, তাই আমি রাজি হইনি।

কর্নেল বললেন, তাহলে আপনার ধারণা রাত একটায় যে ফিসফিস করে 'সুদে-আসলে এক লাখ' বলতে আসে তাকে আপনি মানুষ ভাবছেন?

শিবকালীবাবু বললেন, প্রথম-প্রথম তাই ভেবেছিলুম কিন্তু আপনার যেমন মনে হয়েছে এটা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় তেমনি আমারও মনে হয়েছে।

রক্ষাকালীবাবু লাল চোখ কটমট করে বললেন, মানুষ নয় যদি তাহলে কি ভূত? আমি কিন্তু ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করি না। এখন মনে হচ্ছে এই কাজটা ওই পাগলা সাধুর।

ভোলা বলল, আমারও তাই সন্দেহ, বড়বাবু। অ্যাদ্দিন আপনাদের বলিনি, এখন না বলে পারলাম না।

শিবকালীবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, ওই পাগলা সাধু অত উঁচুতে উঠবে কী মন্ত্র বলে?

রক্ষাকালীবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা ভোলা, আমাদের বাড়িতে গাছের ডাল কাটার জন্যে একটা উঁচু মই ছিল না? সেটা তো দেখতে পাচ্ছি না কিছুদিন থেকে।

শিবকালীবাবু নড়ে বসলেন—তাই তো! মইটার কথা আমার একেবারেই মনে ছিল না। তুমি হয়তো ঠিকই ধরেছ, দাদা। ওই মই-এ চেপে পাগলা সাধুই আমাদের ভয় দেখিয়ে নেমে যায়। তারপর মইটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে চলে যায়। পুলিশ আসার পর বোধহয় সে মইটা দালানবাড়ির জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, আমরা উঠব। আপনারা বরং ভোলাকে দিয়ে মইটা খুঁজে দেখুন। হ্যাঁ, আর-একটা কথা। 'সুদে-আসলে এক লাখ'—এই কথাটাই বা পাগলা সাধুবাবা বলে কেন। আপনারা কি এটা নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা করেছেন?

রক্ষাকালীবাবু বললেন, শিবু কী ভেবেছে জানি না, আমি ভেবেছি। কথাটা কাকেও বলব না ভেবেছিলুম কিন্তু এবার মনে হচ্ছে বলে ফেলা উচিত।

শিবকালীবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, কথাটা বলো।

রক্ষাকালীবাবু চাপাস্বরে বললেন, মায়ের কাছে শুনেছিলুম ছোটকাকা হরকালী রায়ের কাছে বাবা নাকি কিছু টাকা ধার করেছিলেন। তারপর তো ছোটকাকা মারা পড়লেন। ক'দিন ধরে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি চলছিল, তাই তাঁকে দাহ করতে পারা যায়নি। গঙ্গায় লাশ ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। সে কথাও শুনেছি। তারপর নাকি তিনি দিব্যি জ্যান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপর কিছুকাল কাটিয়ে তিনি নাকি হঠাৎ

একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

ভোলা কেন যেন চমকে উঠে বলল, আচ্ছা বড়বাবু, এই পাগলা সাধু আপনাদের সেই ছোটকাকা নন তো? আমি তাঁকে দেখিনি কিন্তু কাল ট্যুরিস্ট লজে পাঁচুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল। সে আমাকে চুপিচুপি বলছিল, জমিদারবাড়ির ছোট শরিক হরকালী রায় সাধুবাবা হয়ে ফিরে এসেছেন বলে তার সন্দেহ। মাথাটা কোনও কারণে বিগড়ে গেছে। কিন্তু পাঁচু তাঁর চেহারা দেখে অবাক হয়েছে।

রক্ষাকালীবাবু হঠাৎ খাপ্পা হয়ে বললেন, একেবারে বাজে কথা। কর্নেল স্যার, আপনার পাঠানো গোয়েন্দা ভদ্রলোক ফিরে এলে বলব ওই পাগলাটাকে যেভাবে হোক যেন ধরে ফেলেন। ভোলা তাঁকে সাহায্য করবে। আর কাঞ্চনপুরের বৃদ্ধ লোকেরা তাকে দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন। তারপর তাকে পাগলাগারদে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললেন, আপনার প্ল্যানটা মন্দ নয়। আমাদের হালদারমশাই একসময় পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। অনেক বাঘা-বাঘা আসামিকে ধরে ফেলার অভ্যাস তাঁর আছে। শুধু চাই কিছু মোটা-মোটা দড়ি।

ভোলা উৎসাহ দেখিয়ে বলল, দড়ি আছে, স্যার। কলকাতার হালদারবাবু যদি আমাকে সঙ্গে নিতে চান, আমি রেডি আছি।

এরপর কর্নেল ও আমি বেরিয়ে এলুম। শিবকালীবাবু আমাদের বেরুনোর জন্য দাদার কাছ থেকে গেটের তালার চাবি চেয়ে নিলেন। গেট খুলে দিয়ে তিনি চাপাস্বরে বললেন, ব্যাপারটা সেরকম মনে হচ্ছে না, কর্নেলসাহেব। আপনাকে বলেছি সে রাতে আমাদের ঘড়িতে যখন একটা দশ, তখন কিন্তু বৈঠকখানার দেওয়াল ঘড়িতে একটা বাজতে দুই মিনিট। তারপর শুয়ে পড়ার পর দেওয়াল ঘড়িতে একটা বেজেছিল। তারপর ওই উৎপাত। এই ঘড়ির ব্যাপারটা সন্দেহজনক, তাই না?

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ। এই ব্যাপারটা সত্যি রহস্যময়। তবে আপনাকে এই সময় একটা গোপন প্রশ্ন করছি। আশা করি সঠিক উত্তর দেবেন। কারণ, আপনার উত্তরের ওপরই আমার পরবর্তী কাজকর্ম নির্ভর করবে।

শিবকালীবাবু ঘরের পেছনটা দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ওই ভোলাকে দেখলেন, ব্যাটাচ্ছেলে দাদার চর। খুলেই বলি। দাদা আজকাল আমাকেও বিশ্বাস করেন না।

কর্নেল বললেন, খুলে বলুন।

শিবকালীবাবু চুপি-চুপি বললেন, আমাদের গৃহদেবতা কালীমাতার নাকি অনেক গয়নাগাটি ছিল। হিরে বসানো সোনার মুকুটও ছিল। তার একটা ফটো দাদার ঘরে আছে। জমিদারি উঠে গেলে সেইসব দামি গয়নাগাটি রাতারাতি চুরি হয়ে যায়। তা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশকে জানানো হয়েছিল, তাতেও কোনও ফল হয়নি।

কিন্তু দাদা নাকি সন্দেহ করেন আমাদের বাবা সেগুলো লুকিয়ে ফেলেছিলেন, পাছে অন্য শরিকরা তা হাতিয়ে নেয়। খুলেই বলি, পাঁচুর কাছে শুনেছি দাদার সন্দেহ সেগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে তা মৃত্যুর আগে মা আমাকে বলে গিয়েছেন। কিন্তু আমার সন্দেহ দাদাই সেগুলো সিন্দুক থেকে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছেন। এইজন্যই আমি শ্বশুরবাড়িতে না থেকে দাদার কাছে এসে থাকি।

আমরা যে পথে এসেছিলুম সেই পথে ফিরে চললুম। আমবাগানের কাছে গিয়ে কর্নেল বললেন, কী বুঝলে, জয়ন্ত?

বললুম, শেষ অবধি ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে গুপ্তধনে। এই গুপ্তধন নিয়েই যত সন্দেহ আর পরস্পরকে অবিশ্বাস আর ওই ভূতুড়ে উৎপাত।

কর্নেল কিছু বললেন না। এতক্ষণে একটা চুরুট ধরালেন। তারপর বাইনোকুলারে দক্ষিণ দিকে দালানবাড়ির ধ্বংসস্তূপে কিছু দেখতে থাকলেন।

জিগ্যেস করলুম, পাগলাবাবাকে দেখতে পাচ্ছেন নাকি?

কর্নেল বললেন, নাহ্। আমি আমার বন্ধু কালীরঞ্জন রায়ের বাড়িটা খুঁজছিলুম। পনেরো বছর আগের কথা। ইতিমধ্যে সব ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেল কেন তাই ভাবছি। অবশ্য আমি যখন এসেছিলুম তখন তার বাড়িটার অবস্থা ছিল জরাজীর্ণ। কাজেই বাড়িটা ভেঙে পড়তেই পারে। চলো, ট্যুরিস্ট লজে ফেরা যাক।

ট্যুরিস্ট লজে ফিরে আমরা পোশাক বদলে নিলাম। তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। বাথরুমে গরম জলের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় স্নানের ইচ্ছে হল না। আর কর্নেল তো শীতকালে মাসে একদিন স্নান করেন। এটা নাকি ওঁর সামরিক জীবনের অভ্যাস।

বেলা একটায় লাঞ্চ করে নিয়ে আমি বিছানায় গড়িয়ে পড়লুম। কর্নেল দক্ষিণের বারান্দায় রোদে চেয়ার পেতে বসলেন। তারপর দেখলুম, পাঁচু এঁটো

থালা-বাটি সাজিয়ে ট্রে হাতে বেরুল এবং কর্নেলের সঙ্গে চাপাগলায় কথা বলতে লাগল। আমার চোখে তখন ভাতঘুমের টান।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কিন্তু কর্নেলের হাতের খোঁচা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বললেন, আড়াইটা বাজে। উঠে পড়ো। রেডি হয়ে নাও। এখনই বেরুতে হবে।

শীতের পোশাক চড়িয়ে এবং কর্নেলের নির্দেশমতো গুলিভরা রিভলভার প্যান্টের পকেটে রেখে বেরিয়ে পড়লুম। দরজায় তালা এঁটে কর্নেল বললেন, শিবকালীবাবু ট্যুরিস্ট লজে ফোন করেছিলেন। সুরঞ্জনবাবুকে তিনি আমাকে খবর দিতে বলেন।

নীচে গিয়ে ফোনের সাড়া পেয়েই শিবকালীবাবুর বললেন, ফোনটা শ্বশুরবাড়ি থেকে করছেন—প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদার এখনও বাড়ি ফেরেননি। তাই দাদা কথাটা আপনাকে জানাতে বললেন।

বললুম, হালদারমশায়ের ব্যাপার। হয়তো পাগলাবাবাকে অনুসরণ করে বনেজঙ্গলে ঘোরাঘুরি করছেন।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, শিবকালীবাবু আমাকে জানিয়েছেন তাঁদের বাড়ির গেটে একটা কাগজ আটকানো ছিল। তাতে কেউ লাল কালিতে লিখেছে—তোমাদের টিকটিকিকে ফাঁদে ফেলেছি। তার লেজ কাটার আগেই দাড়িওয়ালা বুড়োকে খবর দাও।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সর্বনাশ!

কর্নেল বললেন, লেজ কাটার আগেই হয়তো আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাব।

চমকে উঠে বললুম, হালদারমশাই কোথায় আছেন, আপনি কী করে জানলেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, ধ্যানবলে নয়। আমার মাথায় একটা অঙ্ক কষার কাজ চলছে। সেই অঙ্ক থেকেই ঘটনাস্থলের সম্ভাবনা মাথায় এসেছে।

ট্যুরিস্ট লজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কর্নেল কাঞ্চনপুরের দিকে এগিয়ে চললেন। তারপর সেই আমবাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে জমিদার বাড়ির ধ্বংসস্তূপের সামনে পৌঁছলেন। সেখানে একটু দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে কিছুক্ষণ সামনেটা দেখে নিয়ে চাপাস্বরে বললেন, সাবধানে চারদিক লক্ষ রেখে গুঁড়ি মেরে এগোতে হবে। অস্ত্রটা বরং হাতেই রাখো।

তাঁর কথা শুনে প্রথমে একটা আতঙ্কের শিহরন জাগল। কিন্তু অস্ত্রটা হাতে নিতেই মরিয়া হয়ে উঠলুম।

॥ ৬ ॥

কর্নেলের আচরণ আমাকে বিস্মিত করেছিল। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে গুঁড়ি মেরে খুব সতর্কভাবে তাঁকে অনুসরণ করছিলুম। কিছুক্ষণ চলার পর কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, সামনে একটা থাম দেখা যাচ্ছে। বাদবাকিটা ভেঙে পড়া ছাদ আর ইটের দেওয়াল।

আমি তাঁর পাশ দিয়ে উঁকি মেরে সেটা দেখে নিলুম। ওটা একটা থামওয়ালা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, কিন্তু এখনও পুরো গুঁড়িয়ে যায়নি। পাশে একটা বটগাছ চোখে পড়ল। তারপরই দেখলুম একটা ষণ্ডামার্কা লোক বটগাছের গুঁড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। তার পরনে ফুলহাতা সোয়েটার এবং প্যান্ট। মাথা থেকে কান ঢেকে সে মাফলার জড়িয়েছে। তাই মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

আমি কর্নেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তার কথা বলতে যাচ্ছিলুম। কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে তাঁর রিভলভারটা বের করলেন।

শীতের বিকেল। তাতে ওই ধ্বংসস্তূপ ও ঝোপঝাড়। মনে হচ্ছিল দ্রুত দিনের আলো কমে আসছে।

একটু পরে লোকটা সামনের দিকে ইশারা করে কাকে ডাকল। তারপর যাকে দেখলুম, আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। লোকটা আর কেউ নয়, সেই ভোলা। তার হাতে একটা কাটারি। এবার দুজনে বটগাছটার আড়ালে চলে গেল।

একটু অপেক্ষা করার পর কর্নেল আমাকে চোখের ইশারায় সতর্ক করে দিলেন যেন বিন্দুমাত্র শব্দ না করি। কিন্তু সবখানে ঝোপঝাড়ের শুকনো পাতা পড়ে আছে। একটু-আধটু শব্দ চলাফেরা করলেই শোনা যাবে। তবু যতটা সম্ভব সাবধানে গুঁড়ি মেরে কর্নেলের পেছনে এগিয়ে গেলুম। থামের কাছাকাছি গিয়ে কর্নেল আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, ভোলা তার সঙ্গীর সঙ্গে ওদিকে কোথায় গেল কে জানে। কিন্তু আবার ওরা এদিকে আসতে পারে কি না বুঝতে পারছি না। কাজেই একটু অপেক্ষা করা যাক।

দীর্ঘ প্রায় পাঁচমিনিট অপেক্ষা করার পর কর্নেল প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ভেঙে পড়া ঘরটার ভেতর উঁকি দিলেন। তারপর দেখলুম তিনি তাঁর খুঁদে জোরালো আলোর টর্চটা বের করে ভেতরে আলো ফেললেন। কারণ বটগাছের ঘন ডালপালা ভাঙা ঘরটার ভেতর এগিয়ে এসে ভেতরটা আঁধার করে রেখেছে।

আলো জ্বালার পরই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, কী সর্বনাশ!

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কর্নেল ভেতরে ঢুকে গেলেন।

আমি ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলুম কিন্তু কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, তুমি লক্ষ রাখো বটগাছের গুঁড়ির দিকে। ওরা ফিরে এলেই ভেতরে ঢুকে পড়বে এবং আমাকে জানাবে।

তারপরই কানে এলো ভাঙা ঘরের ভেতরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে ফোঁস-ফোঁস শব্দ হচ্ছে। চমকে উঠেছিলুম। সাপ নয় তো! তারপরই মনে পড়ে গেল এই শীতে সাপেরা গর্তে ঘুমোতে গেছে। আমার দৃষ্টি বট্গাছটার গুঁড়ির দিকে কিন্তু কান ঘরের ভেতরে কী ঘটছে তাই শুনছি। একবার চাপাস্বরে কর্নেলের ধমক শুনতে পেলুম, চুপ! ছেলেমানুষি করবেন না। আপনাকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। দড়িগুলো আগে কেটে ফেলি।

একটু পরে কানে এল গোয়েন্দাপ্রবর হালদারমশায়ের গলা, আচমকা পিছন থিইক্যা আমারে ফ্যালাইয়া দিল।

কর্নেল আবার বললেন, চুপ, চুপ। শিগগির আমার সঙ্গে এখান থেকে বেরিয়ে আসুন।

তারপর দেখলুম ভোলা যেখান দিয়ে বেরিয়েছিল সেখান থেকে গুঁড়ি মেরে কর্নেল আর তাঁর পেছনে হালদারমশাই বেরুচ্ছেন। আমি কিছু বলার আগেই কর্নেল বললেন, জয়ন্ত, আমরা যেদিক থেকে এসেছি, সেই দিকে ফিরে চলো।

আগের মতো গুঁড়ি মেরে ধ্বংসস্তূপ আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে সেই আমবাগানে পৌঁছলুম। হালদারমশায়ের মুখে ইটের গুঁড়োমাখা লাল ধুলো এবং তাঁর সোয়েটারের অবস্থা তেমনি নোংরা। তিনি হাসবার চেষ্টা করে বললেন, আমি একজনারে ফলো কইর‍্যা আসছিলাম। তারপর আচমকা পিছন থিইক্যা কে আমার উপর ঝাঁপ দিল আর আমারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁইধ্যা ফেলল। উপুড় হইয়া পড়ছিলাম তাই তাদের দেখি নাই। দুইজন ছিল। আমারে উপুড় কইর‍্যা দুইজনে ওই ভাঙা ঘরের ভিতরে শোয়াইয়া রাখিল। চিৎকার করার সুযোগ

দেয় নাই। মুখে তখনই টেপ সাঁইটা দিয়া—

কর্নেল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার ফায়ার আর্মস সঙ্গে ছিল না?

হালদারমশাই প্যান্টের পকেটে হাত ভরে তাঁর রিভলভার বের করে দেখালেন। বললেন, ওই অবস্থায় এটা ইয়ুজ করব ক্যামনে?

আমি বললুম, ভাগ্যিস ওরা আপনার পকেট হাতড়ে দেখেনি।

কর্নেল বললেন, আপনি কাকে ফলো করে আসছিলেন?

হালদারমশাই প্যান্টের পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে এক টিপ নস্যি নিলেন। তারপর নোংরা রুমালে নাক মুছে বললেন, লোকটারে এখানে আইয়াই বড়বাবুর লগে মিট করতে দেখছি। দুইজনে আড়ালে গিয়া কথা কইতেছিল। লোকটারে দেইখ্যা আমার সন্দেহ হইতাছিল।

কর্নেল বললেন, তখন ছোটবাবু মানে শিবকালী রায় বাড়িতে ছিলেন না?

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন, না। লোকটাকে তিনবার আইতে দেখছি। ওই তিনবারই শিবকালীবাবু বাড়িতে ছিলেন না। হ্যাঁ, একটা কথা বলা দরকার—ভোলারে দিয়া বড়বাবু অরে হয়তো ডাইক্যা আনছিলেন।

আমি বললুম, লোকটা কে আপনি তা জিগ্যেস করেননি বড়বাবুকে?

হালদারমশাই বললেন, করছিলাম। বড়বাবু কইলেন ভদ্রলোক একজন অ্যাডভোকেট। সম্পত্তি লইয়া মামলা-মোকদ্দমায় উনি আমাগো কাম করেন। কিন্তু মিঃ হালদার! এই কথাটা যেন শিবুরে জানাইবেন না। ক্যান কী, শিবুর শ্বশুরের লগে অ্যাডভোকেট হাজারাবাবুর বিবাদ আছে। আইজ কী খেয়াল হইল ছোটবাবু না থাকার সময় হাজরাবাবুকে ফলো করেছিলাম। তারপর ওই কাণ্ড।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন, হাজরাবাবুর পুরো নাম কী, জানেন?

—উপেন হাজরা। বলে গোয়েন্দাপ্রবর তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত এবং পা ছোড়াছুড়ি করে আড়ষ্টতা কাটিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, এখন কী করি কন তো কর্নেলস্যার! হেভি ক্ষুধা পাইছে আর ব্যাগখানও ওনাদের বাড়িতে আছে। আমার আর বড়বাবুরে বিশ্বাস হয় না।

কর্নেল বললেন, আপনি এক কাজ করুন। জয়ন্তের সঙ্গে ট্যুরিস্ট লজে চলে যান। আমি ওদের বাড়ি থেকে শিবকালীবাবুর সাহায্যে আপনার ব্যাগটা উদ্ধার করে নিয়ে যাব।

আমি বললাম, কিন্তু ভোলা আর উপেন হাজরা ওদিকে কোথায় গেল, জানা উচিত ছিল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, সে দায়িত্বটা আমি নিচ্ছি। আমি তো একজন ন্যাচারালজিস্ট। কাজেই প্রকাশ্যে ওই বটগাছের কাছে উপেন হাজরার সঙ্গে আলাপ করার অসুবিধা নেই। আর ভোলা তো আমাকে চেনে।

অগত্যা হালদারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে আমি আমবাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলুম। যেতে-যেতে বললুম, হালদারমশাই, আপনার মুখটা মুছে পরিষ্কার করা দরকার। সোয়েটারটা খুলে ভালো করে ঝেড়ে ফেলুন।

আমার কথা শুনে হালদারমশাই তাঁব নোংরা রুমাল দিয়েই মুখটা যথাসাধ্য মুছে পরিষ্কার করলেন। তারপর সোয়েটার খুলে ঝেড়ে ধুলোবালি সাফ করে নিলেন। সোয়েটার পরতে-পরতে তিনি চাপাস্বরে বললেন, এই দুই দিনে একটা কথা ভালো বুঝছি, জয়ন্তবাবু। বড়বাবু ছোটবাবুর চোখের আড়ালে সম্ভবত অনেককিছু করেন।

—অনেককিছু মানে?

—আমার সন্দেহ ওনাদের গৃহদেবতা কালীমাতার হারানো গয়নাগাটির খোঁজ বড়বাবুর জানা। কিন্তু ছোটবাবুরে তিনি তাঁর ভাগ দিতে চান না।

হাঁটতে-হাঁটতে বললুম, বুঝলুম। কিন্তু রাতদুপুরে ওই ভূতুড়ে উৎপাতের কি কোনও কিনারা করতে পেরেছেন?

হালদারমশাই বললেন, পারিনি, তবে আমার সন্দেহ ওটা বড়বাবুরই কারসাজি। আর ভোলা ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট।

হাসতে-হাসতে বললুম, কিন্তু ভোলা বাড়ির পেছন দিকে দোতলায় জানলার কাছে ওঠে কী করে?

হালদারমশাই থমকে দাঁড়ালেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন, পুকুরপাড়ে ঝোপের ভেতর একখানা মই দেখছিলাম।

আমি শিবকালীবাবুদের বাড়ি থেকে মই হারানোর কথাটা ফাঁস করলুম না। তবে আমার মনে হল ভূতের উৎপাতের রহস্য এতেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে হালদারমশায়ের সিদ্ধান্ত ঠিক। ছোটভাইকে গুপ্তধন থেকে বঞ্চিত করতেই রক্ষাকালীবাবু ভোলার সাহায্যে সেই ভূতুড়ে উৎপাত শুরু করেছেন। এতদিন করেননি কিন্তু ইদানীং হঠাৎ তাঁর এই চক্রান্তের একটা কারণ থাকতে পারে। মা কালীর চুরি যাওয়া গয়নাগাটির খোঁজ দৈবাৎ তিনি পেয়ে

গেছেন। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, শিবকালীবাবু এসে বাড়িতে থাকার জন্য তিনি তা পাচার করতে পারছেন না।

ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছনোর পর সুরঞ্জনবাবুকে ডেকে বললুম, আমাদের এই গেস্ট ভদ্রলোক হঠাৎ এসে পড়েছেন। আমাদের ঘরে একটা ক্যাম্প খাটের ব্যবস্থা করতে পারলেই আর কোনও অসুবিধা হবে না। আর এখনই যদি কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারেন, ভালো হয়।

বলে আলাপ করিয়ে দিলুম, ইনি মিস্টার কে কে হালদার। ইনি কলকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ ইনসপেক্টর। কথাটা যেন চাপা থাকে, সুরঞ্জনবাবু। মিঃ হালদার বিশেষ কাজে এখানে এসেছেন।

সুরঞ্জনবাবু সঙ্গে-সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হালদারমশাইকে নমস্কার করে বললেন, ওপরে যান, স্যার। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

হালদারমশাই বললেন, আই অ্যাম হাংরি।

এমন ভঙ্গিতে বললেন, মনে হল হালদারমশাই তাঁর আগের পুলিশজীবনে ফিরে গেছেন।

কর্নেল আমাকে ঘরের চাবি দিয়েছিলেন। দরজা খোলার পর হালদারমশাই সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে বসলেন। বললুম, আপনি আগে বাথরুমে গিয়ে মুখহাত ভালো করে ধুয়ে নিন।

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন, বুদ্ধি কইর‍্যা বুটজুতা পরছিলাম। নয় তো আবার একজোড়া জুতা কিনতে হইত।

বলে তিনি বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই পাঁচু ট্রেতে দু-প্লেট আলুকাবলি আর দু-কাপ চা রেখে গেল।

পাঁচু কোনও কথা বলল না দেখে বুঝতে পারলুম হালদারমশাইকে সে কলকাতার পুলিশ ভেবে যেন একটু ভয় পেয়েছে। তার ভয় ভাঙানোটা উচিত মনে করলুম না।

মিনিটপাঁচেক পরে পাঁচু আবার এল একটা ভাঁজ করা ক্যাম্পখাট আর বগলদাবা করে বিছানা-কম্বল-বালিশ নিয়ে।

বললুম, ওখানেই রেখে দাও। সময়মতো আমরা নিজেরাই বিছানা পেতে নেব।

কর্নেলের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলুম। তিনি ফিরলেন তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে।

ঘরে আলো জ্বলছে, বাইরে অন্ধকার এখনই ঘন হয়েছে।

কর্নেলের হাতে হালদারমশায়ের ব্যাগ। কর্নেলকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। হালদারমশাই ব্যস্তভাবে জিগ্যেস করলেন, আমি শুইতাম ছোটবাবুর ঘরে। লক্ষ করছি উনি বাহির হইলে নিজের ঘরে তালা দিতেন। আপনারে তিনি কী কইলেন?

কর্নেল তেমনি গম্ভীর মুখে বললেন, শিবকালীবাবুকে বলেছি আপনি আমাদের সঙ্গে ট্যুরিস্ট লজে থাকবেন। তাই উনি ব্যাগটা আমাকে দিতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু আমার মনে একটু ভয় জেগেছে। আজ রাতে হাজরাবাবু কিংবা ভোলা তাঁকে হয়তো মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। সব কথা পরে খুলে বলব। আগে কফি খেয়ে নিই।

বললুম, শিবকালীবাবুকে আপনি সাবধান করে দিয়ে এলেন না কেন?

কর্নেল বললেন, দিয়েছি। আজ রাতে উনি শ্বশুরবাড়িতে থাকবেন। তবে আমাদের সঙ্গে সময় মতো ওঁর দেখা হবে।

বললুম, হাজরাবাবু আর ভোলা বটগাছের ওদিকে পেছনে কোথায় গিয়েছিল জানতে পেরেছেন?

কর্নেল বললেন, পেরেছি। ওরা গিয়েছিল একটা বিশেষ ধ্বংসস্তূপের কাছে।

বলে কর্নেল ক্লান্তভাবে চুপ করে গেলেন।

॥ ৭ ॥

রাত্রে আমাদের ঘরে বসে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল। পাঁচুকে বলা ছিল সে যেন এঁটো থালা-বাটিগুলো নিয়ে যায় এবং কর্নেলের জন্য এক কাপ কফি দিয়ে যায়।

তখন রাত সাড়ে ন'টা বাজে। চারদিক একেবারে স্তব্ধ। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে বাইরের বারান্দাটা দেখে নিলুম। জনপ্রাণীটি নেই। কর্নেল চেয়ারে বসে কফি খাচ্ছিলেন। মাঝখানে একপাশে ক্যাম্পখাটটা পেতে হালদারমশায়ের বিছানা তৈরি হয়ে গেছে। তিনি বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বললেন, এখানে শীতটা বড্ড বেশি।

বললুম, মা গঙ্গার কারণেই শীতের এত বেশি উপদ্রব।

—ঠিক কইছেন। বলে হালদারমশাই এক টিপ নস্যি নিলেন। ইতিমধ্যে তিনি কর্নেলের মুখে শুনে নিয়েছেন কীভাবে দৈবাৎ তাঁকে আমরা উদ্ধার করেছি। সেই কথার জের টেনে এবার তিনি বললেন, কর্নেলস্যার, ওই ভোলারে আমি ছাড়ুম না। ওর একখান ঠ্যাং-এ একখান গুলি মাইর‍্যা খোঁড়া কইর‍্যা দিমু।

কর্নেল বললেন, আপনাকে গুলি করতে হবে না। পুলিশই ওর সংগতি করবে। আমি ট্যুরিস্ট লজে ফিরে টেলিফোনে থানায় যোগাযোগ করেছি। আমার অভ্যাস তো জানেন, কোথাও বেরোনোর আগে এলাকার পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারপর বেরোই। কারণ, শেষ কাজটা পুলিশকেই করতে হয়।

জিগ্যেস করলুম, এই ঠান্ডা কনকনে রাতে আবার বেরুবেন নাকি?

কর্নেল বললেন, না হালদারমশাইকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় দেখতে না পেয়ে ভোলা আর তার গার্জেনরা সতর্ক হয়ে গেছে। ওরা নিশ্চিত টের পেয়েছে আমরাই হালদারমশাইকে দড়ির বাঁধন কেটে মুক্ত করেছি। তা ছাড়া, শিবকালীবাবুকে আমি বলেছি তিনি যেন অন্তত আজ রাতের মতো ও বাড়িতে না থাকেন।

বললুম, ভোলা বা রক্ষাকালীবাবু আপনাকে হালদারমশায়ের ব্যাগ আনতে দেখেনি?

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, ভোলা দেখেছে। তবে রক্ষাকালীবাবু তখন কালীবাড়িতে ছিলেন। ওঁদের সেবাইত এসেছিল সন্ধ্যা আরতি দিতে। যাই হোক, আজ রাত্রে বেরুনোর কোনও প্রয়োজন দেখছি না। থানার অফিসার ইনচার্জ মহেন্দ্রবাবু জমিদারবাড়ির আনাচে-কানাচে পুলিশ ফোর্স গোপনে মোতায়েন রাখবেন।

পাঁচু বিছানার সঙ্গে হালদারমশায়ের জন্য একটা মশারিও এনে দিয়েছিল। হালদারমশাইকে কর্নেল মশারিটা খাটাতে সাহায্য করলেন। কারণ, পাঁচু কোনও পেরেক বা হাতুড়ি দিয়ে যায়নি। এসব জিনিস স্বভাবত মজুত থাকে কর্নেলের কিটব্যাগে।

এ রাতে ঘুমটা গাঢ় হয়েছিল। ঘুম ভেঙেছিল কালকের মতো পাঁচুর ডাকে। সে ঘরে ঢুকে টেবিলে চায়ের কাপ রেখে কালকের মতোই আমার মশারিটা গুটিয়ে দিল। উঠে বসে দেখলুম হালদারমশাই এবং কর্নেলের মশারি গোটানো রয়েছে এবং তাঁরা দুজনেই বিছানায় নেই।

পাঁচু আমার হাতে চায়ের কাপটা দিয়ে চাপাস্বরে বলল, বুড়ো সাহেবের সঙ্গে পুলিশের সেই অফিসার ভোরবেলায় বেরিয়ে গেছেন। আমার একটা খটকা লাগছে, স্যার।

বললুম, বলো।

পাঁচু বলল, জমিদারবাড়িতে ভূতের উৎপাত হয়েছে, একথা সবাই জানে। ওই পুলিশ অফিসার কি সেই তদন্তে এসেছেন, স্যার?

বললুম, হ্যাঁ। উনি কর্নেলসাহেবের বন্ধু।

পাঁচু তখনই দরজার পরদা তুলে বারান্দাটা দেখে এসে চাপাস্বরে বলল, আমার একটা সন্দেহ হয়, স্যার। রাতবিরেতে ফিসফিস করে বড়বাবু-ছোটবাবুর কাছে কে নাকি টাকা চায়। সে অন্য কেউ নয়, ওই পাগলাবাবা। জমিদারবাড়িতে বড়বাবুর কাছে থাকার সময় কথায়-কথায় ভোলা বলে ফেলেছিল মা কালীর লক্ষ-লক্ষ টাকা দামের গয়নাগটি হাতিয়ে বড়বাবু-ছোটবাবুর বাবা কালীপ্রসাদবাবু কলকাতায় ব্যাবসা ফেঁদেছিলেন। সেই ব্যাবসায়ে লোকসান খেয়ে তিনি চলে এসেছিলেন। শেষ বয়সে খুব কষ্ট পেয়ে মারা যান। মা কালীর অভিশাপ স্যার, বুঝলেন তো!

বললুম, বুঝেছি।

এই সময় বাইরে থেকে ম্যানেজার সুরঞ্জনবাবুর গলা শোনা গেল।—এই পাঁচু, ছোটসাহেব কি ঘুম থেকে উঠেছেন?

বলে তিনি পরদা ফাঁক করে একটু হাসলেন—আজ একটু সকাল-সকাল উঠতে পেরেছেন। তো কর্নেলসাহেব ফোন করে আমাকে বললেন আপনাকে যেন একটা খবর দিই।

জিগ্যেস করলুম, কী খবর?

ততক্ষণে পাঁচু ঘর থেকে কেটে পড়েছে। সুরঞ্জনবাবু বললেন, কর্নেলসাহেব জমিদারবাড়িতে অপেক্ষা করছেন। আপনাকে তিনি শিগগির সেখানে যেতে বললেন।

কথাটা বলেই তিনি চলে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি বাথরুম সেরে পোশাক বদলে তৈরি হয়ে নিলুম। আজ পাঁচু আমার অস্ত্রটা দেখতে পায়নি। কারণ ওটা আমি তোশকের তলায় ম্যাট্রেসের ওপর রেখেছিলুম। সিক্স রাউন্ডার .২২ ক্যালিবারের অস্ত্রটি প্যান্টের ডান পকেটে ঢুকিয়ে বেরিয়ে এলুম। তারপর দরজায় তালা এঁটে হন্তদন্ত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলুম।

সোয়া আটটা বাজে। চারপাশে গাঢ় কুয়াশা। সতর্কতার জন্য প্যান্টের দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে থাকলুম। ডান হাতের আঙুল রিভলভারের ট্রিগারে রাখা, যেন হঠাৎ আক্রান্ত হলে পালটা আক্রমণ করতে পারি। যেতে-যেতে বারবার মনে হচ্ছিল কর্নেল জমিদারবাড়িতে এখন কী করছেন? আমাকেই বা তিনি ডাকলেন কেন? কোনও ঘটনা ঘটেনি তো!

সেই আমবাগানের ভেতর দিয়ে শর্টকার্ট করে জমিদার বাড়িতে গিয়ে দেখি বাইরে পুলিশের জিপ আর একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। একদঙ্গল সশস্ত্র কনস্টেবল আর কয়েকজন অফিসার মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

খোলা গেট দিয়ে আমি ভেতরে ঢুকেই দেখলুম কর্নেল আর হালদারমশাই রক্ষাকালীবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। আমাকে দেখে কর্নেল বললেন, এসো জয়ন্ত। একটা অভাবিত ঘটনা ঘটে গেছে।

জিগ্যেস করলুম, শিবকালীবাবুর কোনও বিপদ হয়নি তো?

রক্ষাকালীবাবু বললেন, শিবু লাশ আনতে গেছে।

চমকে উঠে বললুম, কার লাশ?

হালদারমশাই বলে উঠলেন, পাগলাবাবার। এখানে আইয়্যা শুনছি সক্কলে পাগলাবাবার ভয়ে তটস্থ। একলা-দোকলা দেখলেই সে নাকি ঢিল ছোড়ে।

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, হালদারমশাই, আপনি বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলুন। এসো জয়ন্ত।

ঠাকুরবাড়ির দরজা খোলা ছিল। সেদিকে বেরিয়ে দেখি পুকুরের পূর্ব পাড়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে দুজন কনস্টেবল আর চারটে লোক একটা স্ট্রেচারে চাপিয়ে লাশ আনছে। তারা এদিকে না এসে পুকুরের দক্ষিণ পাড় দিয়ে ঘুরে ঠাকুরবাড়ির পেছনে অদৃশ্য হল।

কর্নেল বললেন, চলো, তোমাকে জায়গাটা দেখিয়ে আনি। তুমি কাল আমাকে জিগ্যেস করছিলে অ্যাডভোকেট হাজরাবাবু আর ভোলা বটগাছের ওদিকে কোথায় গিয়েছিল। চলো দেখবে।

পুকুরের উত্তর পাড় হয়ে কর্নেলকে অনুসরণ করে ধ্বংসস্তূপে ঢুকতে হল। তারপর ডানদিকে ঘুরে ফাঁকা জায়গা দিয়ে এগিয়ে সামনে সেই বটগাছটা দেখতে পেলুম। বটগাছটার ওপাশে একটা ঢিবি দেখা যাচ্ছিল। তারপরই চোখে পড়ল ওই জায়গায় কেউ বা কারা মাটি খুঁড়েছে এবং সেই মাটি ঢিবির আকার নিয়েছে। গর্তটা প্রায় ফুট ছয়েক গভীর। সেই গর্তের ভেতর থেকে আমাদের

পায়ের কাছ অবধি চাপ-চাপ টাটকা রক্ত। রক্তগুলো জমাট বেঁধে গেছে। উত্তেজনায় আমার শরীর যেন গরম হয়ে উঠেছিল। বললুম, এখানে সেই পাগলা সাধুর লাশ পড়ে ছিল মনে হচ্ছে। প্রথমে কার চোখে পড়েছিল এটা?

কর্নেল বললেন, আমার দুর্ভাগ্য জয়ন্ত, তুমি তো দেখে আসছ, যেখানেই যাই চিরকালের অদৃশ্য এক আততায়ী আমার সামনে একটা করে রক্তাক্ত লাশ ছুড়ে ফেলে আমাকে চ্যালেঞ্জ করে।

বললুম, আচ্ছা, লাশটা কি আপনারাই আবিষ্কার করেছিলেন?

কর্নেল বললেন, কাল এদিকটা দেখার সময় পাইনি। তাই হালদারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছিলুম। পাগলাবাবাকে মাথা আর বুকে কেউ গুলি করে মেরেছে। হ্যাঁ, এখানেই মেরেছে। তারপর গর্ত খুঁড়ে তার লাশটা পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। নিশ্চয় বটগাছের ওদিকে কেউ পাহারা দিচ্ছিল। আমাদের সাড়া পেয়েই লাশটা গর্তে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। আমি হালদারমশাইকে এখানে পাহারায় রেখে থানায় গিয়েছিলুম। হালদারমশায়ের হাতে রিভলভার দেখে খুনিরা এসে পড়লে নিশ্চয় ভয় পেত।

বললুম, কাল বিকেলে ভোলা আর হাজরাবাবু এখানে কোথায় এসেছিল?

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটা জ্বেলে বললেন, আমার অঙ্কের হিসেবে বলা যায় ওরা দুজনে এখানে পাগলাবাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। জয়ন্ত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাঁচুর ধারণা সত্য। এই পাগলাবাই জমিদারবাড়ির ছোট শরিক হরকালীবাবু। তিনি সম্ভবত ছিটগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু গোপনে এই এলাকায় তাঁর ঘোরাঘুরির একটাই কারণ থাকা সম্ভব। মা কালীর চুরি যাওয়া গয়নাগাটির খোঁজ সম্ভবত তিনি রাখতেন। তাই সন্ন্যাসী হয়েও এখানে ফিরে এসেছিলেন।

কর্নেল হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর কারও উদ্দেশে বলে উঠলেন, আসুন মিঃ চ্যাটার্জি। জয়ন্তের কথা আপনাকে বলেছি। আর জয়ন্ত, ইনি কাঞ্চনপুর থানার ওসি মিঃ মহেন্দ্র চ্যাটার্জি।

মিঃ চ্যাটার্জি কাছে এসে বললেন, রক্ষাকালীবাবু পাগলাবাবার লাশ দেখে বললেন তিনি তাকে চেনেন না। কিন্তু শিবকালীবাবু জোর দিয়ে বললেন তিনি মুখ দেখে চিনতে পেরেছেন। এটা তাঁর ছোটকাকা হরকালী রায়ের লাশ। তিনি বরাবরই ছিটগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু এমন মানুষকে কে গুলি করে মারবে তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না।

কর্নেল বললেন, এই গর্তটা গতরাতেই খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। কারণ খুনিরা

জানত পাগলাবাবা প্রায়-ই বটতলায় এসে বসে থাকেন। অবশ্য এটা আমার একটা ধারণা।

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন, হ্যাঁ, আমি হরকালী রায় সম্পর্কে সব খবর এই থানায় এসেই পেয়ে গিয়েছিলুম। ঠিক যেন সেই ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা। মৃত্যুর পর সেই লোক জীবিত হয়ে কী করে বাড়ি ফিরতে পারে, প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছিলুম ঝড়বৃষ্টির রাতে অর্ধমৃত হরকালীবাবুকে ভুল করে মৃত ভেবে নাকি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর যেভাবেই হোক তিনি কারও সাহায্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ওইভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে তাঁর স্নায়ুবিকৃতি ঘটে যায়।

কর্নেল বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমারও একই ধারণা। কিন্তু প্রশ্ন হল ওঁকে এভাবে খুন করল কে এবং খুনের উদ্দেশ্যই বা কী?

মিঃ চ্যাটার্জি মুচকে হেসে বললেন, ভোলাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কারণ আমরা এসেই লক্ষ করেছিলাম তার পায়ে এবং হাতে একটু-আধটু কাদা লেগে আছে। সে ভালো করে কাদা ধোয়ার সময় পায়নি। জেরার চোটে তার পেট থেকে কথা বের করতে অসুবিধা হবে না। চলুন, জমিদারবাড়ির আর এক পাগলা রক্ষাকালী রায় কী বলছেন দেখা যাক।

কর্নেল বললেন, রক্ষাকালীবাবুর একটা বন্দুক আছে। কিন্তু আমার মতে পাগলাবাবাকে বন্দুকে নয়, পিস্তল বা রিভলভারের গুলিতে প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি ছুড়ে মারা হয়েছে।

ওসি বললেন, কিন্তু খুনের মোটিভটা কী? আপনার মতটা শোনা যাক।

কর্নেল হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, জমিদার বাড়ির গৃহদেবতার বহু লক্ষ টাকা দামের গয়নাগাটি চুরি গিয়েছিল।

ওসি বললেন, জানি। এখানকার সবাই জানে সেকথা।

কর্নেল বললেন, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে সেই গয়নাগাটি জমিদারবাড়ির কোনও শরিকই চুরি করেছিল এবং তা এখনও এখানেই কোথাও লুকানো আছে। পাগলাবাবা হরকালী রায় যেভাবেই হোক তার খোঁজ পেয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সেকথা জানার জন্যই সম্ভবত তাঁর ওপর বরাবর অত্যাচার হত এবং এবার তাঁকে রাগের বশে খুন করা হয়েছে।

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন, কর্নেলসাহেব, আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা এপথেই এগুবো।

॥ ৮ ॥

পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে ঝোপজঙ্গলের ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে কর্নেল এবং ওসি মিঃ চ্যাটার্জি চাপাগলায় কিছু আলোচনা করছিলেন। মন্দিরের কাছাকাছি আসার পর এক পলকের জন্য আমার চোখে পড়ল কেউ যেন এইমাত্র মন্দিরের আড়ালে চলে গেল। আমি চাপাস্বরে কথাটা বলতেই কর্নেল একদিকে এবং মিঃ চ্যাটার্জি অন্যদিকে মন্দিরের পেছনে অদৃশ্য হলেন। পরক্ষণেই একটা ধস্তাধস্তির শব্দ কানে এল। এক লাফে এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা ষণ্ডামার্কা গুঁফো লোককে দুজনেই ধরে আছেন। লোকটা এবার গর্জে উঠল, আমি একজন অ্যাডভোকেট। আমার নাম এইচ পি হাজরা। রক্ষাকালীবাবু আমার মক্কেল।

মিঃ চ্যাটার্জি পুলিশের লোক। তিনি তাঁর সোয়েটারের গলার দিকটা খামচে ধরে বেটন দিয়ে পিঠের দিকটায় আঘাত করলেন। তারপর হাসতে-হাসতে বললেন, বুঝলেন কর্নেলসাহেব, কৃষ্ণনগরের অ্যাডভোকেট শচীন্দ্র চৌধুরীর পালিয়ে যাওয়া সেই মুহুরি এই হাজরাবাবু। অনেক টাকা চুরি করে এখানে এসে হাজরাবাবু গা-ঢাকা দিয়ে আছে। ওকে আমরা খুঁজছিলুম।

কর্নেল বললেন, আসামিকে নিয়ে চলুন, মিঃ চ্যাটার্জি। ব্যাপারটা জমে উঠবে। কারণ, রক্ষাকালীবাবু এই লোকটাকে অ্যাডভোকেট বলে আমাদের মিঃ হালদারকে এবং তাঁর ভাই শিবকালীবাবুকেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে একজন পুলিশ অফিসার এবং কয়েকজন সশস্ত্র কনস্টেবল ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন। অফিসারটি অবাক হয়ে বললেন, এটাকে যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে, স্যার?

ওসি বললেন, এই সেই হরিপদ হাজরা। মনে হচ্ছে জমিদারবাড়ির একটা চক্রান্তে লোভের বশে হরিপদ হাজরাও জড়িয়ে গিয়েছিল।

জমিদারবাড়ির প্রাঙ্গণে ঢোকার পর রক্ষাকালীবাবু হাঁউমাউ করে বললেন, আমাদের অ্যাডভোকেটকে কেন ধরেছেন আপনারা?

কর্নেল বললেন, এ একজন মুহুরি। তার অ্যাডভোকেটের টাকা চুরি করে এখানে গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

শিবকালীবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, এতক্ষণে বুঝতে পারছি দাদা ভোলা আর এই লোকটাকে সঙ্গে করে মা কালীর হারানো গয়নাগাটির খোঁজে চক্রান্ত করেছিল।

কর্নেল বললেন, রক্ষাকালীবাবু আপনার বন্দুকটা ছাড়া কি আর কোনও আগ্নেয়াস্ত্র আছে?

রক্ষাকালীবাবু ভাঙা গলায় বললেন, নাহ্! কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এসব কী হচ্ছে?

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন, এই হরিপদ হাজরাকে প্রিজন ভ্যানে নিয়ে যান, মিঃ বোস।

সেই পুলিশ অফিসারটির ইঙ্গিতে দুজন তাগড়াই চেহারার কনস্টেবল তাকে বাইরে নিয়ে গেল।

হালদারমশাই এতক্ষণ চুপচাপ সব দেখছিলেন। এবার বললেন, ওসি সাহেব, এবার আগে রক্ষাকালীবাবুর ঘরখান সার্চ করা উচিত।

মিঃ চ্যাটার্জি একটু হেসে বললেন, আমাদের প্ল্যান তৈরি। চলুন রক্ষাকালীবাবু, আগে আপনার ঘরটা দেখা যাক।

দোতলার ওই ঘরে তালা দেওয়া ছিল। পাশে শিবকালীবাবুর ঘরেও লক্ষ করলুম তালা আঁটা আছে। রক্ষাকালীবাবু তাঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাবি বের করে ঘরের তালা খুললেন।

কর্নেলের ইঙ্গিতে হালদারমশাই এবং একজন কনস্টেবল জানলাগুলো খুলে দিল তারপর সুইচ টিপে আলো জ্বালল। রক্ষাকালীবাবু একটা চেয়ারে বসে বিকৃতমুখে বললেন, সারা রাত অন্ধকারে রেখে এতক্ষণে আলো!

লক্ষ করলুম কর্নেল আচমকা তাঁর হাতের বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে তাঁর গায়ের আলোয়ান খুলে ফেললেন। এবার চমকে উঠে দেখলুম আলোয়ানের তলায় ফুলহাতা সোয়েটারের বুকে কয়েক জায়গায় রক্তের ছাপ। তারপর তাঁর পরনের পাজামার খানিকটা তুলে ধরে কর্নেল বললেন, এই দেখুন সেই গর্তটার কালো কাদা লেগে আছে পায়ে। শুধু পায়ের পাতা ধুয়ে এসেছেন।

রক্ষাকালীবাবু কর্নেলের কাজে বাধা দিতে সাহস পাননি। এবার কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, আমি ছোটকাকাকে খুন করিনি। ওই বজ্জাত হরিপদ হাজরা কাকার ওপর অত্যাচার করতে-করতে গুলি চালিয়ে দিল। আমি তখন কাকাকে দু-হাতে চেপে ধরে ছিলাম।

ওসি বললেন, তাহলে গুলি করে খুন করেছে আপনার স্যাঙাত ওই হাজরা?

রক্ষাকালীবাবু বললেন, হ্যাঁ। রিভলভার না পিস্তল তা জানি না। আমার

কাছে হাজরাবাবুই লুকিয়ে রেখেছিল।

কর্নেল বললেন, হাজরাবাবুর কাছে তো সেটা নেই। কোথায় সেটা?

—আমি তা জানি না।

এতক্ষণ শিবকালীবাবু বড়-বড় চোখে তাকিয়ে সব দেখছিলেন এবং শুনছিলেন। এবার রাগে খাপ্পা হয়ে বললেন, আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমাকে লুকিয়ে তুমি, ভোলা আর হাজরাবাবু গুপ্তধন খুঁজে বের করার চক্রান্ত করেছিলে। আমাকে তার ভাগ দিতে চাওনি বলেই আমি এ বাড়িতে এলে তুমি ভূতের ভয় দেখাতে।

এই সময় বারান্দায় এক ভদ্রলোককে দেখা গেল। তাঁকে দেখে শিবকালীবাবু বললেন, আমার শ্বশুরমশাই এসে গেছেন। উনি আমাকে নিষেধ করতেন এদের চক্রান্তের পেছনে ওত পাততে।

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, কথাটা তুমি ভুলে গেছ, বাবাজি। শাহবাজ খান কাবুলিওয়ালার কথা তোমার মনে নেই? সে এই এলাকায় টাকা ধার দেওয়ার কারবার করত। তারপর সে ডাকাতের হাতে মারা পড়েছিল। বেশি দিনের নয়, দশ-বারো বছর আগের কথা। এরপর যারা তার টাকা ধার নিয়েছিল, রাতদুপুরে তাদের বাড়ির আনাচে-কানাচে তার ভূত ফিসফিস করে দেনার পরিমাণ জানিয়ে যেত। এ নিয়ে কাঞ্চনপুর একেবারে ভয়ে তটস্থ হয়ে গিয়েছিল।

শিবকালীবাবু বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো। মনে পড়ে গেছে সেই কাবুলি ভূতের কথা। কিন্তু আমি যে স্পষ্ট শুনেছি নীচের ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে একটা বাজলেই দাদা চেঁচামেচি করে বন্দুক ছুঁড়তেন। আর আমার ঘরের জানলার কাছে কাবুলি ভূতটা বলত, সুদে-আসলে এক লাখ।

হালদারমশাই বললেন, আপনারে ভয় দেখাইত আপনার দাদা, যাতে আপনি এখানে না এসে শ্বশুরবাড়িতে থাইক্যা যান।

শিবকালীবাবু বললেন, আমার কিন্তু মনের মধ্যে একটা সন্দেহ হয়েছিল। তাই মাঝে-মাঝে পৈত্রিক বাড়িতে এসে রাত কাটাতুম।

কর্নেল দেওয়ালে টাঙানো বড়-বড় অয়েল পেন্টিং দেখছিলেন। হঠাৎ জানলার পাশে একটা অয়েল পেন্টিং দেওয়াল থেকে একটু সরাতেই কী একটা চৌকো জিনিস মেঝেতে পড়ল।

ওসি মিঃ চ্যাটার্জি বললেন, ওটা কী, টেপরেকর্ডার মনে হচ্ছে?

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু এটার পাশে তার জড়িয়ে হুক তৈরি করা

হয়েছে। এক মিনিট।

বলে তিনি খাটের তলায় টর্চের আলো ফেললেন। তারপর একটা লম্বা কঞ্চি বের করে বললেন, প্ল্যানটা আশা করি বুঝতে পারলেন মিস্টার চ্যাটার্জি।

কর্নেল হুকের ভেতর কঞ্চিটা ঢুকিয়ে সুইচ টিপে দিলেন। প্রথমে ঘসঘস করে কিছুটা শব্দ তারপর স্পষ্ট জোরালো গলায় বেজে উঠল—সুদে-আসলে এক লাখ।

ওসির নির্দেশে একজন পুলিশ অফিসার কঞ্চি আর টেপরেকর্ডারটা নিয়ে গেলেন। এবার শিবকালীবাবু দাদার দিকে আঙুল তুলে গর্জন করলেন, ঠক, জোচ্চোর! তোমার পেটে-পেটে এই বুদ্ধি ছিল? তুমি তোমার নিজের ছোটভাইকে ভয় দেখিয়ে তোমার চক্রান্ত থেকে দূরে সরাতে চেয়েছিলে? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

এবার কর্নেল আরও একটা ছবির কাছে গেলেন। বললেন, বাঁধানো ছবি একইভাবে অনেকদিন টাঙানো থাকলে তার নীচের দাগটা দেখা যায় না। এটাকেও দেখছি নড়ানো হয়েছিল। দেখি কী বেরোয় এটার পেছন থেকে।

পেছন থেকে এবার বেরোল একটা লাল ছেঁড়া কাপড়ে বাঁধা পুঁটলি। কর্নেল সেটা খুলে দেখেই বললেন, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গৃহদেবতার লক্ষ-লক্ষ টাকার দামি জিনিস কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তারই একটা নকশা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সারা এলাকা এখন ধ্বংসস্তূপ। তাই ওই গুপ্তধন উদ্ধার করা খুবই কঠিন।

ওসির নির্দেশে একজন অফিসার বারান্দা থেকে রক্ষাকালীবাবুর কাছে এসে বললেন, চলুন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

রক্ষাকালীবাবু ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বললেন, আমি ছোটকাকাবাবুর কাছ থেকে এই নকশাটা কেড়ে নিইনি। হাজরাবাবু তাঁকে গুলি করার জন্য পিস্তল তুলেছে দেখে ছোটকাকা এটা আমার দিকে ছুড়ে দেন। তারপর হাজরা পরপর তিনটে গুলি করার পর তিনি আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমি জানতুম না হাজরাবাবু আর ওই বদমাশ ভোলা তাঁকে এভাবে মেরে ফেলবে। এই নকশাটা আমি হাজরাকে দিইনি। বলেছিলাম বাড়িতে এসো, তারপর কথা হবে।

পুলিশ অফিসার তাঁকে টানতে-টানতে নিয়ে গেলেন। এরপর আমরা নীচের তলায় ভোলার ঘরে গেলুম। পুলিশ ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও সেই আগ্নেয়াস্ত্রটা পেল না। এই সময় কর্নেল চুরুট ধরিয়ে উঠোনে নেমে কী যেন ভাবছিলেন। তাঁর হাতে তখনও সেই লাল ন্যাকড়ায় বাঁধা নকশাটা। তিনি সেটা

আমাকে ধরতে দিয়ে ডাকলেন, মিঃ চ্যাটার্জি, আমি নিশ্চিত নই। তবে আমার ধারণা হরিপদ হাজরা মন্দিরের পেছনে লুকিয়ে নিশ্চয়ই কোনও একটা কাজ করছিল। তার তো ঘটনার পরই গা ঢাকা দেওয়ার কথা। কাজেই আসুন, দেখি হাজরা কী করছিল।

কর্নেলের পেছনে আমি ও হালদারমশাই এবং কর্নেলের আগে ওসি মিঃ চ্যাটার্জি সেই দরজা দিয়ে ঠাকুরবাড়িতে গেলুম। মন্দিরের পেছনে কিছু ঝোপঝাড় আছে। কর্নেল একটা ঝোপের সামনে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলুম ঝোপটা কাত হয়ে আছে। নীচের মাটিটাও যেন পায়ে চেপে বসানো। কর্নেল ঝোপটা দু-হাতে টেনে শেকড়সুদ্ধ উপরে ফেললেন। তার পরই রুমালে জড়ানো একটা জিনিস দেখা গেল। কর্নেল সেটা তুলে নিয়ে বললেন, মাই গুডনেস, এটা তো দেখছি সিক্স রাউন্ডার রিভলভার!

মিঃ চ্যাটার্জি রুমালে জড়িয়ে রিভলভারটা নিয়ে একটু হেসে বললেন, কর্নেল সাহেবের সম্পর্কে যা শুনেছিলাম তার প্রমাণ আজ বারবার পেয়েছি।

হালদারমশাই বললেন, কর্নেলস্যার, এই ম্যাপখান পাইলে মা কালীর গয়নাগাটি উদ্ধার করতে পারবেন।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আগে মামলাটা শেষ হোক, দোষীরা সাজা পাক। তারপর আবার একবার কাঞ্চনপুরে এসে হানা দেওয়া যাবে।

